মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং - ২৭২
১৭শ বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
আগষ্ট ২০১২ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

ঈদ মোবারক

কাশ্মীরে সূফী অভ্যুদয়ের পুরোধা হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানীর (র) মাজার শরীফের প্যানোরামা (তাজিকিস্তান)

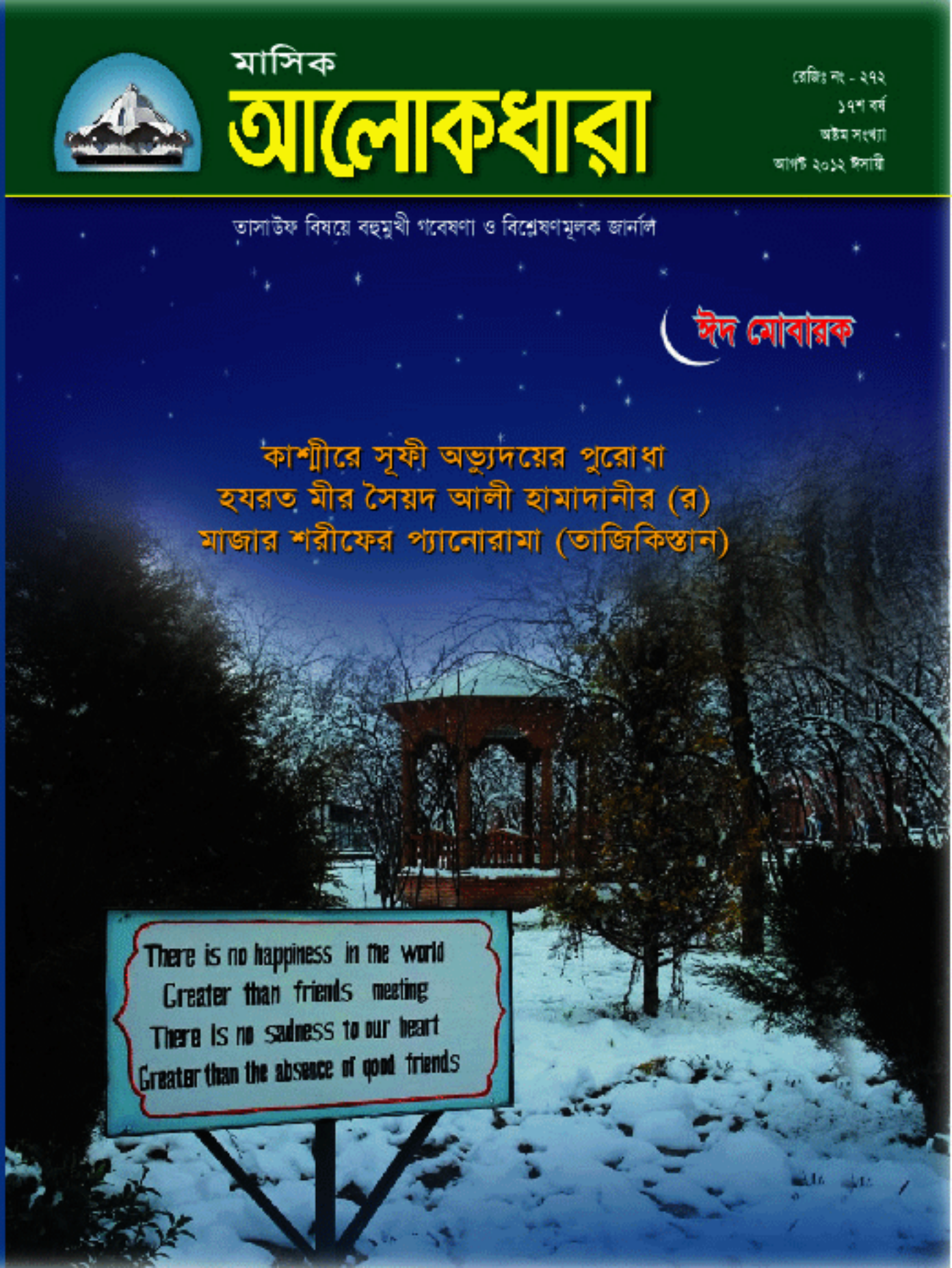

তাজিকিস্তানে হযরত সৈয়দ আলী হামাদানীর (র) মাজারে গিলাফ দিচ্ছেন
ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রতিভা পাতিল; সঙ্গে তাজিক প্রধানমন্ত্রী আকিল আকিলভ।

তাজিকিস্তানে হযরত সৈয়দ আলী হামাদানীর (র) মাজার শরীফের বহির্ভাগ

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

আগষ্ট ২০১২ ঈসায়ী
রমজান-শাওয়াল ১৪৩৩ হিজরী
শ্রাবন-ভাদ্র ১৪১৯ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

যোগাযোগঃ
লেখা সংক্রান্তঃ ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্তঃ ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৫, সিডিএ, সি/এ (তেতলা) মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৮৮৫৫

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট এর একটি প্রকাশনা

website : www.sufimaizbhandari. org
e-mail address :
alokdhara@sufimaizbhandari.org
sufialokdhara@gmail.com

সূচী

- *সম্পাদকীয় :* **ঈদের সাওগাত : উন্নত চরিত্রের ১১টি নমুনা -২**
- **আন্ত-ধর্মীয় সংঘাত নিরসন**
  –ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ---------- ৩
- **ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও বিধি-বিধান**
  –আলোকধারা ডেস্ক ---------- ৫
- **ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরকে যিনি পরিণত করেছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি ও কারুশিল্পের বেহেশতে হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানী (রঃ)**
  –মোঃ মাহবুব উল আলম ---------- ৯
- **জলোয়া-এ নূরে মোহাম্মদী বা তফ্‌ছিরে ছুরা এনশেরাহ্**
  –হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী---- ১২
- **মহিমামণ্ডিত রজনী লাইলাতুল কদর মোবারক**
  – অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী--- ১৫
- **শাহেনশাহে বেলায়ত মওলা আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহু**
  – আবুল ফজল মোহাম্মদ ছাইফুল্লাহ সুলতানপুরী ---------- ১৯
- **একক বিশ্ব সমাজ গঠনে ৮টি সূফিবাদী দিক নির্দেশনা**
  – **মূল :** আব্দুল আজিজ সাইদ ও নাথান মিঃ ফাইক
  – অনুবাদ : এ এন এম এ মোমিন ---------- ২৫
- **শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**
  – **মূল :** এম. ফেতুল্লাহ গুলেন
  –অনুবাদ : অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ২৯
- **গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাযি.)'র বেলায়তী প্রভাব বিশ্বব্যাপী শুধু মাত্র পূর্বাঞ্চলের জন্য নয়**
  – মুফতী ছালেহ সুফিয়ান ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডারী---------- ৩৩
- **'জাকাত বোর্ডকে' কার্যকর করে গরিবের দিন বদলের উদ্যোগ নিন**
  – আ ব ম খোরশিদ আলম খান---------- ৩৬
- **চট্টল বিজেতা সূফী কদল খান গাজী আলাইহির রাহমাহ্**
  –মুহাম্মদ রবিউল আলম---------- ৩৮
- **নবীদের ইতিহাস**
  –অনুবাদঃ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম---------- ৪২
- সংগঠন সংবাদ ---------- ৪৫

সম্পাদকীয়...

ঈদের সাওগাত : উন্নত চরিত্রের ১১টি নমুনা

মাসিক 'আলোকধারার' এ সংখ্যায় আমরা পবিত্র মাহে রমজানের সিয়াম সাধনায় খোদায়ী পুরস্কার হিসেবে ঘোষিত ঈদুল ফিতরের আনন্দমন্ডিত ক্ষণে আমাদের প্রিয় পাঠকবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে জানাই ঈদ মোবারক, ঈদের শুভেচ্ছা। সকলেই পরম শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাবমুক্ত অবস্থায় থাকুন, রাব্বুল আলামিনের কাছে এটাই আমাদের একান্ত মুনাজাত। আল্লাহ্ তাঁর অন্তহীন রহমতে দয়াল নবীজীর (দঃ) উসিলা এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী শাহসূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ), হযরত শাহসূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভান্ডারী (কঃ), হযরত শাহসূফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ), শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) দোয়ায় আমাদের সকলকে তথা বিশ্বমানবতাকে সহি-সালামতে রাখুন।

মাহে রমজান উত্তম চরিত্র নির্মাণের প্রশিক্ষণকাল। এই উত্তম চরিত্র বিনির্মাণের মাপদন্ড হলো নবীজীর (দঃ) আদর্শ। পবিত্র হাদীসের আলোকে চরিত্রের কয়েকটি নমুনা পেশ করা হলো। মানবজীবনের সব অঙ্গন, ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ-রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই আছে নবীর আদর্শ। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালনেও রয়েছে তাঁর আদর্শ। যারা এ আদর্শ ধারণ করবে, নিজের জীবনে ও কাজে-কর্মে তা বাস্তবায়ন করবে, তারাই হবে আদর্শবান, পরপ্রজন্মের জন্য তারা হবে আদর্শ পূর্বসূরি। নিম্নে উত্তম চরিত্রের কয়েকটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো : (১) তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করে না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং যারা প্রতিপালকের ওপর ভরসা রাখে। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম) হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে পাখিদের মতো রিজিক দান করবেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে বের হয় অথচ সন্ধ্যায় ফিরে আসে উদরপূর্তি হয়ে। (জামে তিরমিজি, সুনানে ইবনে মাজাহ) (২) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা : রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের এই বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক যে, সব অবস্থায়ই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটি শুধু মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। সুখ ও আনন্দের কিছু হলে সে শোকর আদায় করে। ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর দুঃখ-কষ্ট এলে সে সবর ও ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য মঙ্গলজনক। (সহিহ মুসলিম) (৩) অল্পতে তুষ্ট থাকা : রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে পরিমিত রিজিক প্রদান করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার দেয়া রিজিকে তাকে তুষ্ট করে দিয়েছেন। (সহিহ মুসলিম)

৪. অঙ্গীকার রক্ষা করা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : ক) কথা বললে মিথ্যা বলা খ) অঙ্গীকার করলে তা রক্ষা না করা ও গ) আমানত রাখলে খেয়ানত করা। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম) (৫) বিনয় ও তাওয়াজ্জু : ওমর (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, হে লোকসকল! তোমরা বিনয় ও তাওয়াজ্জু অবলম্বন কর। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তাওয়াজ্জু অবলম্বন করবে আল্লাহতায়ালা তার মর্যাদাও বুলন্দ করে দেবেন। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি) (৬) সত্যবাদিতা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। কেননা, সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম) (৭) লজ্জাশীলতা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিটি ধর্মেরই একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা। (সুনানে ইবনে মাজাহ) (৮) নম্রতা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহতায়ালা কোমল আর তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। সহিহ মুসলিম। অন্য হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে অনেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। (সহিহ মুসলিম)

(৯) অন্যের প্রতি দয়া : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষের ওপর দয়া করে না আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না। (সহিহ বুখারি) (১০) বদান্যতা ও দানশীলতা : হজরত জাবের (রা.) বলেন, কখনও এমন হয়নি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি 'না' বলেছেন। (সহিহ বুখারি) (১১) পরোপকার : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সব সৃষ্টিই আল্লাহর পোষ্য। সব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দীয় ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর পোষ্যের সঙ্গে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি)।

আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব গুণাবলী অর্জনের তৌফিক দিন, আমীন!

আন্ত-ধর্মীয় সংঘাত নিরসন
(Inter-faith conflict resolution)

●ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী●

ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক সম্প্রদায়সমূহ শান্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। যদিও ধর্মকে প্রায়শঃ ভয়ানক সংঘাতের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তথাপি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রাথমিক উৎস নয়। বরঞ্চ ধর্মীয় বিশ্বাস-ভিত্তিক শান্তি বিনির্মাণের পদ্ধতিসমূহ পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও বোঝা পড়ার জন্য খুবই উপযোগী। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে প্রায় এক দশকেরও অধিক সময়ব্যাপী ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো সারা বিশ্বে অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে গুয়াতেমালা এবং নাইজেরিয়ায় শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টা দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল সেগুলো বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সংলাপের মাধ্যমে শান্তি বিনির্মাণের ধারণা তুলনামূলকভাবে নূতন। যেখানে ধর্মকে স্বয়ং সংঘাতের উৎস হিসেবে মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মের অবদান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বৈকি। কেননা এতে বুঝা যায়, ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের একমাত্র কারণ নয়। আরও অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো সংঘাত সৃষ্টিতে সম্ভবতঃ অবদান বা ভূমিকা রাখে। যা হোক, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল আন্ত-ধর্মীয় বিশ্বাস শান্তি-বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় কী ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করা। এ প্রসঙ্গে নাইজেরিয়ায় শান্তি বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেলাম, যেহেতু নাইজেরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্ত-বিশ্বাস পদ্ধতি (inter-faith approach) প্রয়োগ করা হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে আন্ত-বিশ্বাস সংঘাত বা বিরোধ নিরসনের কাঠামো কিরূপ হতে পারে সে ব্যাপারেও আলোকপাত করা হবে।

আন্ত-বিশ্বাস সংঘাত নিরসন প্রচেষ্টা (Inter-faith conflict resolution): আন্ত-বিশ্বাস বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাথমিক পর্যায় বা স্তর হল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সংলাপের আয়োজন করা এবং সংলাপের মাধ্যমে আন্ত-সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটানো। আন্ত-বিশ্বাস সংলাপ সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্মক (Smock) বলেন, "আন্ত-বিশ্বাস সংলাপ হল একটি সহজ ধারণা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজন এক সাথে গোল টেবিলে বসে আলোচনা করা, খোলা মনে কথাবার্তা বলা কিন্তু কথাবার্তা বলার প্রকৃতি কিংবা উদ্দেশ্য তত সহজ নয়। কারণ কথাবার্তার বিষয়াদি বহুমুখী।" এ পদ্ধতি হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়, সমঝোতা, বোঝাপড়া, আলোচনার দ্বারা এমন একটি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা যাতে একই সমাজে সকল ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের প্রচলিত প্রথা বা ঐতিহ্যসমূহ সম্পর্কে জানার, পরস্পরের জ্ঞান ও ভাব বিনিময়, একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করার, বিপদে-আপদে একে অপরকে সাহায্য করার এবং সর্বোপরি একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সমসাময়িক ধর্মীয় পণ্ডিতগণ একমত হয়েছেন যে, একবিংশ শতাব্দী হল 'আন্ত-বিশ্বাস সংলাপ শতাব্দী'। অনেকের মত ডায়ানা এক (Diana Eek)ও মনে করেন যে, বিশ্ব-উন্নয়ন (global development) এর ফলে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার একটি নূতন দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বাস-প্রথা (Faith Traditions): যদিও বিশ্বাস-প্রথা পদ্ধতি সকল ধর্ম বিশ্বাসের প্রথা বা ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, তথাপি এ পদ্ধতি মূলতঃ প্রধান তিনটি ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আলোকপাত করে। এ তিনটি ধর্ম-বিশ্বাস হচ্ছে ইসলাম, ইয়াহুদী (Judaism) এবং খ্রীস্টান ধর্ম। এ তিনটি ধর্ম-বিশ্বাসকে আমরা এক কথায় ইব্রাহিমী ধর্ম-বিশ্বাস বলতে পারি। কারণ এ তিনটি ধর্মই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে গুরু হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে একজন প্রতিষ্ঠাতা নেতা, একেশ্বরবাদের প্রবর্তক হিসেবে তিনটি ধর্মই মান্য করে। যদিও এ তিনটি ধর্মে আরও অনেক পয়গাম্বর রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ই সর্বপ্রথম। সুতরাং এ তিনটি ধর্ম-বিশ্বাসকে ইব্রাহিমী ধর্ম-বিশ্বাস বলা যেতে পারে। ইব্রাহিমী ধর্ম-প্রথার বাইরেও অনেক ধর্ম-বিশ্বাসের রীতি-নীতি রয়েছে যেগুলো থেকে ইব্রাহিমী ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারীরা আন্ত-সাম্প্রদায়িক সংঘাত নিরসনের জন্য অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আন্ত-বিশ্বাস সংলাপঃ আন্ত-বিশ্বাস সংলাপ হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করার একটি

ব্যবস্থা। ষ্ট্যানলী সামার্থা (Stanley Samartha) এর মতে, "সংলাপ হচ্ছে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস ও আদর্শের অনুসারী লোকদের নিয়ে একই সমাজে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সম্পর্কের একটি অংশ-পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়ার একটি প্রক্রিয়া।"

আন্ত-বিশ্বাস সংলাপ অনেক দিক দিয়ে নিছক কথোপকথনের চাইতে ভিন্ন। কথোপকথন হচ্ছে এক প্রকারের শান্তিপূর্ণ আলাপ (a kind of tranquility) যা আন্ত-বিশ্বাস সংলাপে অনুপস্থিত। কথোপকথন হচ্ছে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে আলাপচারিতা যাতে কোন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না এবং যে আলাপের মাঝে উভয়ের মধ্যে মৌলিক কোন মত পার্থক্যও থাকেনা। কিন্তু আন্ত-বিশ্বাস সংলাপের মধ্যে গভীরতা থাকে, আলোকিত মনের প্রকাশ থাকে এবং একজন ব্যক্তির ভিতর ও বাহিরের ধর্মীয় ভাবাবেগ তাড়িত আত্মপরিশুদ্ধির বিভিন্ন মত ও পথের বিশ্লেষণ থাকে। এ ধরণের সংলাপের মধ্যে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে একটি ব্যবহারিক ও বাস্তবভিত্তিক ঐক্য অর্জনের প্রচেষ্টা থাকে। এটা কেবলমাত্র কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্তের আলোকে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, প্যালেস্টাইনের নির্যাতিত মুসলিমদের সাথে ইসরাইলের ইহুদীদের জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদুল আকসার পবিত্রতা সংরক্ষণ নিয়ে সংলাপ কিংবা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত নিরসনের জন্য সংলাপ।

আন্ত-বিশ্বাস সংলাপের ধরণ (Forms): স্ট্যানলী সামার্থা (Stanley Samartha) আন্ত-বিশ্বাস সংলাপের চারটি প্রাথমিক ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল নিম্নরূপ :

(ক) জীবনের সংলাপ (Dialogue of life) : এ ধরনের সংলাপে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচিত হয় যেগুলো সমাজে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে বাধাগ্রস্ত করে। আলোচকগণ সাধারণ মূল্যবোধ তথা শিক্ষা ও নাগরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কিভাবে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা যায় সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করে থাকেন।

(খ) কাজের সংলাপ (Dialogue of aelion) : এ ধরনের সংলাপে সামাজিক ন্যায় বিচার এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এরূপ প্রকল্পে একসাথে কাজ করে সমাজে অবদান রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, দারিদ্র্য কিভাবে দূর করা যায়, ভুল বুঝাবুঝি, সংঘাত, গৃহহীনতা ইত্যাদি থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় সে ব্যাপারে যৌথভাবে কাজ করার জন্য একটি মডেল তৈরী করা।

(গ) অভিজ্ঞতার সংলাপ (Dialogue of Experience) : এ ধরনের সংলাপে দৈনন্দিন কাজে ধর্মে বিশ্বাসী লোকজনের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব কতটুকু তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার যার ধর্মীয় বিশ্বাস মতে পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধি বলতে কী বুঝায় এবং মানুষের জীবনকে এটা কিভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একটা মতৈক্যে পৌঁছার চেষ্টা করা হয়।

(ঘ) অভিজ্ঞ বা পণ্ডিত লোকদের সংলাপ (Dialogue of Experts) : বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম-তত্ত্ববিদ এবং দার্শনিকদের মধ্যে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপে আলোচকগণ বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব ও তথ্য নিজস্ব গবেষণা ও পুস্তকাদির আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত সংলাপগুলোর মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ অর্জন করা যাবে বলে আশা করা যায়:

(১) ধর্ম আন্ত-সাম্প্রদায়িক সংঘাতের প্রাথমিক কারণ নয়।

(২) বিভিন্ন সমাজে ধর্ম শান্তি বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারে।

(৩) বিভিন্ন ধর্মে শান্তি বিনির্মাণকে একটি পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে মনে করা হয়।

(৪) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৫) বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যপ্রণালী ও কাঠামো দেয়া আছে। এগুলোর সঠিক প্রয়োগ দরকার। (Renee Garfinkel)।

(৬) ধর্মীয় বিশ্বাস স্বার্থপরতা ও লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হবার জন্য তাগিদ দেয়। মানুষকে উদার হতে বলে। ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়।

(৭) বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এমন কতগুলো নীতিবাক্য ও আদর্শ আছে যে গুলোর অধিকাংশই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং কিছু সাধারণ লক্ষ্য (Common goal) অর্জনের জন্য মিলগুলোর ভিত্তিতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(৮) যেহেতু প্রত্যেক ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ ও ভালবাসার মাধ্যমে খোদার নৈকট্য অর্জন করা, সেহেতু এরূপ সংলাপ শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে জোরদার করবে।

(চলবে)

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও বিধি-বিধান

●তথ্য সংকলন : আলোকধারা ডেস্ক●

হিজরি সালের শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখকে ঈদুল ফিতর বলা হয়। রমজানের দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর পহেলা শাওয়াল ঈদের দিন তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীয় বান্দার জিয়াফত ও দাওয়াতের দিন। এই দিন রোজা রাখা যাবে না; খোদ শরিয়ত কর্তৃক তা নিষেধ ও হারাম। আল্লাহর দাওয়াতেই সাড়া দিতে হবে। তিনি পুরস্কৃত করবেন তাদের, যারা সিয়াম সাধনা করেছে, রাতে ইবাদত করেছে, আল্লাহকে স্মরণ করেছে, তার হুকুম পালন করেছে।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যখন তাদের (রোজাদার বান্দাদের) ঈদের দিন হয় অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন, তখন আল্লাহ তায়ালা রোজাদার বান্দাদের সম্পর্কে ফিরেশতাগণের সঙ্গে গর্ব করে জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার ফিরেশতাগণ! বল দেখি, আমার কর্তব্যপরায়ণ প্রেমিক বান্দার বিনিময় কী হবে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রভু! পূর্ণরূপে তার পারিশ্রমিক দান করাই তো তার প্রতিদান। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দারা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে, অতঃপর আমার কাছে দোয়া করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে (ঈদগাহে) গমন করেছে। আমার সম্মান, মর্যাদা, দয়া, বড়ত্ব ও মহত্বের কসম, জেনে রাখ, আমি তাদের দোয়া কবুল করব। অতঃপর বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা এখন যেতে পার, আমি তোমাদের পাপগুলোকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে (বায়হাকি)।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, ঈদুল ফিতরের দিন ফেরেশতাগণ ঈদগাহের পথে বিভিন্ন অংশে দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করতে থাকেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আপন করুণাময় মহান পরোয়ারদিগারের দরবারে উপস্থিত হও। তিনি আপন দয়া ও মেহেরবানিতে নেক আমল ও ইবাদতের তাওফিক দান করেন। অতঃপর এর বিনিময়ে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করেন। তোমাদিগকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য হুকুম করা হয়েছে; তোমরা তা পূরণ করেছ। তোমাদিগকে রোজার হুকুম করা হয়েছে; তোমরা তাও পূরণ করেছ, এভাবে তোমরা তার আনুগত্য করেছ। অতএব, এখন তোমরা তোমাদের প্রাপ্য বিনিময় ও পুরস্কার নিয়ে যাও। অতঃপর ঈদের নামাজ শেষ হওয়ার পর ফেরেশতাগণ ঘোষণা করেন, অবশ্যই আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে সফলকাম ও কৃতকার্য অবস্থায় বাড়িতে ফিরে যাও। এভাবেই এ দিনটির নাম হয়েছে 'পুরস্কারের দিন'। উর্ধ্ব জগতেও এই দিনটিকে একই নামে অভিহিত করা হয় (তরগিব তরহিব : ২/৩৮৮)।

ঈদের নামকরণ : 'ঈদ' ইয়াদুন ধাতু থেকে নির্গত একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ বারবার প্রত্যাবর্তন করা। প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে দু'বার করে এর আগমন ঘটে; তাই এর নামকরণ হয় 'ঈদ'।

কেউ কেউ বলেছেন, এদিনে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ রহমত সহকারে বান্দার প্রতি রুজু করেন তথা প্রত্যাবর্তন করেন ও রহমতের দৃষ্টি করেন; তাই এর নামকরণ হয়েছে 'ঈদ' (মোজাহেরে হক : ২য় খণ্ড, ২৭৭ পৃ.)।

কেউ কেউ বলেছেন, প্রতি বছরই ঈদ ফিরে আসুক; উম্মত এর দ্বারা বারবার উপকৃত হোক, এই শুভ কামনার দিকটি লক্ষ্য করে এর নামকরণ হয় 'ঈদ'।

আর 'ফিতর' শব্দটির অর্থ হলো, রোজার অবসান। দীর্ঘ মাসব্যাপী নিয়াম সাধনার বিপরীতে এই ফিতর শব্দটি ব্যবহৃত হয় (আশি'অ্যাতুল্লাম'আত : ২য় খণ্ড, ৬৬০ পৃ.)।

ঈদের রাতের ফজিলত : হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈদের রাতে সওয়াবের নিয়তে ইবাদত-বন্দেগী করে, তার অন্তর সেই দিনও মরবে না, যেইদিন অন্য লোকের অন্তর মরে যাবে, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন (তরগিব, তরহিব)।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতকে ইবাদতের মাধ্যমে জিন্দা রাখে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

১. ৮ জিলহজের রাত, ২. আরাফাতের রাত, ৩. ঈদুল আজহার রাত, ৪. ঈদুল ফিতরের রাত, ৫. ১৫ শাবানের রাত (তরগিব, তরহিব)।

ইসলামে ঈদের প্রবর্তন : ইসলামে ঈদের প্রবর্তন হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় গিয়ে দেখতে পেলেন, পারসিক প্রভাবে মদিনাবাসীরা তখনও শরতের পূর্ণিমায় নওরোজ উৎসব এবং বসন্তের পূর্ণিমায় মিহিরজান উৎসব নিয়মিতভাবেই উদ্‌যাপন করছে। এই উৎসবগুলোতে তারা বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দমেলা করত, যা সম্পূর্ণ ইসলামী রীতিনীতির পরিপন্থী

এবং বিজাতীয় আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাই হুজুর আলাইহিস ছালাতু ওয়াস সাল্লাম মুসলমানদের ওই উৎসব দুটি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহতায়ালা তোমাদের ওই দুই উৎসবের বিনিময়ে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার পবিত্র দুটি দিন দান করেছেন, **এতে তোমরা পবিত্রতার সঙ্গে উৎসব পালন কর।**

এতদ্ব্যতীত হিজরি দ্বিতীয় সালে মাহে রমজান খতম হওয়ার দু'দিন আগে ঈদুল ফিতর ও ছদকা-ফিতর সংক্রান্ত একটি আয়াত নাজিল হয়।

হজরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) ও আল্লামা আবুল আলিয়া (রহ.) ওই আয়াতের তাফসির ও তরজমা এভাবে করেছেন, নিশ্চয় সাফল্য অর্জন করেছে সেই ব্যক্তি, যে ছদকা-ফিতর দান করেছে এবং ঈদের নামাজ পড়েছে (আহকামুল কোরআন : জাসসাছ : খণ্ড ৩, পৃ. ৪৭৩)।

এমনিভাবে হিজরি দ্বিতীয় বর্ষেই ঈদুল আজহার নামাজ ও কোরবানি সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয়।

হজরত হাসান বছরি (রহ.) বলেন, ওই আয়াতে ঈদুল আজহার নামাজ ও কোরবানির নির্দেশ দান করা হয়েছে (আহকামুল কোরআন : জাসসাছ : খণ্ড ৩, পৃ. ৪৭৫)।

ঈদের তাৎপর্য : বিশ্বের প্রতিটি জাতির জন্য বছরের মধ্যে এমন কয়েকটি দিন আছে, যেগুলোকে তারা নিজেদের কোনো না কোনো জাতীয় উৎসবের স্মরণীয় দিন হিসেবে গণ্য করে থাকে। এই দিনগুলোতে তাদের নিজস্ব রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানের প্রচলন থাকে। সভ্য-অসভ্য প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য সাধারণ দিনের তুলনায় এই দিনগুলোতে পোশাক-পরিচ্ছদ ও মেলামেশার পদ্ধতির মধ্যেও বেশ একটা পরিবর্তন ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান নেহায়েত একটা স্বভাবসুলভ এবং সরল-সহজ বিষয় ছিল। কিন্তু মানবপ্রবৃত্তির বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতার কারণে এসব আনন্দ-উৎসব সাধারণত ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা পূরণ এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সম্ভোগ অর্জনের উদ্দেশ্যেই উদযাপিত হয়ে থাকে। আবার অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত লাভ ও মুনাফার উদ্দেশ্যে, অনেকেই নিছক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে এবং কেউ কেউ বিশেষ চাঁদা ও নজর-নিয়াজ অথবা স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে এসব উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে। ফলে এর কোনো সার্থকতা ও তাৎপর্য অবশিষ্ট থাকেনি।

উম্মতের প্রতি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে প্রচুর ইহসান ও অনুগ্রহ রয়েছে, সেগুলোর একটি এটাও যে, তিনি এসব আচার-অনুষ্ঠান ও মেলাগুলোর আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন করেছেন। মূলতঃ এসব অনুষ্ঠান মানবের স্বভাবগত বিষয়। তাই তিনি এগুলোর মূলোৎপাটন না করে অন্যান্য ইসলামী রীতিনীতির মতো এ উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যেও আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৃষ্টিসেবা, মানবতাবোধ এবং পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহমর্মিতা এবং এমনি ধরনের নানা শিক্ষা ও সবকের প্রবর্তন করেছেন। তাই সর্বপ্রথম তিনি তকবিরকে ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য 'আকবর'-এর চেয়ে উত্তম ও উপযুক্ত কোনো শব্দই হতে পারে না। এমনিভাবে সর্বগুণ সমন্বয়কারী হওয়ার জন্য 'আল্লাহ' শব্দের ওপরে আর কোনো শব্দ নেই। তাই তিনি তকবিরের জন্য এ শব্দদ্বয়কে নির্বাচন করেছেন। মানুষ যাতে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে না ওঠে সেজন্য তিনি দিনের শুরুভাগে নামাজের ব্যবস্থা করেছেন। ঈদের এ জামাতে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, শিক্ষিত-মূর্খ সবারই একসঙ্গে শরিক হয়ে করুণাময়ের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিধান দিয়েছেন। মানবতাবোধ ও পারস্পরিক সহমর্মিতার জন্য সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন। ঈদের জামাতের আগেই সেই ছদকায়ে ফিতর দান করার জন্য উদ্বুদ্ধও করেছেন। ঈদুল আজহায় উৎকৃষ্টতম খাদ্য গোশত বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সবাই চেষ্টা করে থাকে সমাজের অক্ষম ব্যক্তিদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে ও সহানুভূতি জানাতে। কেউ যেন বাদ না পড়ে, বঞ্চিত যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য করেই প্রবর্তিত হয়েছে জাকাতের বিধান। তাই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা যত্নবান হয় এই দিনে গরিবের দুঃখ ঘোচাতে, এতিমের মুখে হাসি ফুটাতে।

মোটকথা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ ও খেদমতে খালকের নিষ্ঠা ও চেতনাকে জাগ্রত করে এটাকে বাস্তবায়ন করার মহান উদ্দেশ্যেই ঈদের দিনগুলোতে উপরোক্ত খোদায়ী বিধানগুলোর প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঈদের তত্ত্ব, তাৎপর্য ও হেকমত। বলা বাহুল্য, ইসলামের এই আদর্শের দৃষ্টান্ত অন্য কোনো জাতি বা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে মোটেও দেখা যায় না।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে : 'প্রত্যেক জাতিই ঈদ উদ্‌যাপন করে; কিন্তু আমাদের (বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত) ঈদ হচ্ছে এ-ই।'

ঈদের দিনের ১৩টি সুন্নত : ১. শরিয়তের সীমার ভেতর থেকে সাধ্যানুযায়ী সজ্জিত হওয়া, ২. মিসওয়াক করা, ৩.

গোসল করা, ৪. সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম (অথবা ধৌত করা) পোশাক পরিধান করা, ৫. খোশবু ব্যবহার করা, ৬. অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠা, ৭. ফজরের নামাজের পর অতি শিগগিরই ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া, ৮. ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার আগে খোরমা অথবা অন্য কোনো মিষ্টিদ্রব্য খাওয়া, ৯. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ছদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়া, ১০. কোনো ওজর অসুবিধা না থাকলে ঈদের নামাজ মসজিদে না পড়ে (ঈদগাহে) ময়দানে পড়া। ওজর অসুবিধা বলতে, অনবরত বৃষ্টি থাকা, অসুস্থতার দরুণ দূরের ময়দানে যেতে না পারা ইত্যাদিকে বোঝায়, ১১. ঈদগাহে একপথে যাওয়া এবং অন্যপথে ফিরে আসা। ১২. ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া। ১৩. ঈদগাহের পথে-ঈদুল ফিতরে অনুচ্চস্বরে এ তকবির পড়তে পড়তে যাওয়া : আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা' ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

রমজান মাসের কতিপয় অবিস্মরণীয় ঘটনা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) জীবদ্দশায় রমজান মাসে বিভিন্ন অবিস্মরণীয় ঘটনাবলী সংঘটিত হয়। তার মধ্য থেকে কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

এক. নবুওয়াতের প্রথম বছর রমজান মাসে হেরা গুহায় পবিত্র কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়।

দুই. নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর রমজান মাসে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত হামজা (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

তিন. নবুওয়াতের দশম রমজান মাসে রাসূলের (সা.) চাচা আবু তালিব এবং হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

চার. দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজানুল মুবারকে ইসলামের প্রথম জিহাদ ঐতিহাসিক 'গাজওয়ায়ে বদর' সংঘটিত হয়।

পাঁচ. পঞ্চম হিজরির রমজান মাসে খন্দকের যুদ্ধ হয়।

ছয়. অষ্টম হিজরির ১০ রমজান জুমার দিনে মক্কা বিজয় হয়।

সাত. অষ্টম হিজরির ১৬ রমজান কিয়ামত পর্যন্ত সুদকে হারাম করা হয়।

আট. নবম হিজরির রমজান মাসে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

নয়. এগারো হিজরির রমজান মাসে হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

দশ. আটান্ন হিজরির মাহে রমজানে হযরত আয়েশা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

ঈদের দিনে মহিলাদের বাড়তি দায়িত্ব

ঈদ উৎসব, ঈদের আনন্দ এবং ঈদের আমল শুধু পুরুষদের জন্যই নয়; বরং এসবে সমানভাবে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঘরে আসে 'ঈদুল ফিতর' বা আনন্দের ঈদ। মুমিন মুসলমানের জীবনে নেমে আসে এক পূতপবিত্র আনন্দের পরশ। সিয়াম সাধনার পর আনন্দ করাটাই স্বাভাবিক। তবে তা অবশ্যই হতে হবে ইসলামী শরিয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে। ঈদের আনন্দে নারীদের সম্পৃক্তি একটি অপরিহার্য বিষয়। ঈদের দিন নারীদের দায়িত্ব পুরুষদের তুলনায় একটু বেশি। পরিবারের রান্নাবান্না, ছেলেমেয়েদের গোসল, তাদের সাজগোজ সবই তাদের করতে হয়। এসব দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের জন্যও এ কাজগুলো সারতে হয়। এতসব সত্ত্বেও নারীকে ঈদের আমল ছেড়ে দিলে চলবে না। খুব সকালে উঠে প্রথমে যথাসময়ে ফজরের নামাজ আদায় করে নিতে হবে। পারিবারিক ঝামেলামুক্ত হয়ে নিজেও প্রয়োজনীয় সাজগোজ করবেন। ফিতরা ওয়াজিব হলে ফিতরা আদায় এবং দান-খয়রাত করতে হবে। নারীদের জন্য ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়। যদি নামাজ আদায়ের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ঈদগাহে থাকে, তবে তারাও নামাজ আদায় করতে পারেন। ঈদের আনন্দ ও ভালোবাসা পরিবারের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন একজন সফল নারী। নারীরা তাঁদের আমলটুকু সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে পালন করলেই গোটা সমাজ ব্যবস্থা হবে সুশৃঙ্খল। সুতরাং, ঘরকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করা একজন দায়িত্বশীল নারীর প্রধান কাজ।

ঈদের দিনের কিছু আমল

ঈদুল ফিতর নেক বান্দাদের জন্য খুশির দিন। যারা রোজা পালন করেছেন, তাদের জন্য আনন্দ ও উৎসবের দিন হচ্ছে ঈদুল ফিতর। আর পাপী-তাপীদের জন্য এই দিনটি হলো শাস্তি ও আজাবের। সাহাবী হজরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) ঈদের দিন কাঁদছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আজ খুশির দিন ওই ব্যক্তির জন্য, যার রোজা কবুল হয়েছে। ঈদুল ফিতরের দিন হলো পুরস্কার লাভের দিন। এদিন একদল ফেরেশতা দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা দয়াময় প্রভুর দিকে ছুটে চলো। তিনি তোমাদের কল্যাণ দান করবেন। তিনি তোমাদের পুরস্কার দেবেন।'

ঈদের পূর্ণাঙ্গ আনন্দ-খুশি ও কল্যাণ অর্জন করতে হলে আরো ঘনিষ্ঠ করতে হবে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক,

ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ করতে হবে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক। উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে বন্ধু-বান্ধব স্বজনদের সঙ্গে সহমর্মিতা ও সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে।

ঈদকে একটি পবিত্র উৎসব হিসেবে পালন করতে হবে। এর সুন্নত তরিকা হলো ঈদের নামাজের আগে গোসল করে নেয়া, ভালো পোশাক পরে আতর-সুগন্ধি মেখে ঈদগাহে যাওয়া, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হলে ঈদের নামাজের আগে তা আদায় করে দেয়া, পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, সম্ভব হলে এক রাস্তায় যাওয়া, অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা, ঈদগাহে যাওয়ার আগে মিষ্টিমুখ করে নেয়া, ঈদগাহের দিকে ধীরস্থিরভাবে যাওয়া, নামাজ শেষে আত্মীয়-স্বজনের কবর জিয়ারত করা, ঘরে ফিরে চার রাকাত নফল নামাজ পড়া।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঈদকে তাকবির দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।' রাসুল (সা.) আরো ইরশাদ করেছেন, পাঁচটি রাত জেগে যে ব্যক্তি ইবাদত করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। রাতগুলো হলো : ১. জিলহজের রাত, ২. আরাফার রাত, ৩. ঈদুল আজহার রাত, ৪. ঈদুল ফিতরের রাত, ৫. মধ্য শাবানের রাত। সুতরাং ঈদুল ফিতরের রাতে ইবাদত করা খুবই পুণ্যময় কাজ। ঈদের অনাবিল সুখ-আনন্দ শুধু রোজাদারদের জন্য। যারা ইচ্ছাকৃত রোজা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের জন্য এ আনন্দ নয়। ঈদের আনন্দ-খুশিতে ভরে উঠুক সারাদেশ, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ।

ঈদের নামাজ পড়ার নিয়ম

ঈদের দিন ইমামের পেছনে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে মনে এই নিয়ত করে নিবে–'আমি অতিরিক্ত ছয় তাকবিরসহ এই ইমামের পেছনে ঈদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করছি।' এরপর উভয় হাত কান বরাবর উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে নিবে। হাত বাঁধার পর ছানা অর্থাৎ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়ে নিবে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দিবে। দ্বিতীয়বারও একই নিয়মে তাকবির বলে হাত ছেড়ে দিতে হবে। ইমাম সাহেব তৃতীয়বার তাকবির বলে হাত বেঁধে আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য যে কোনো সূরা তিলাওয়াত করবেন। এ সময় মুক্তাদিরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এরপর ইমাম সাহেব নিয়মমত রুকু-সিজদা সেরে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন। মুক্তাদিরা ইমাম সাহেবের অনুসরণ করবেন। দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম সাহেব প্রথমে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়বেন। এরপর আগের মতো তিন তাকবির বলতে হবে। প্রতি তাকবিরের সময়ই উভয় হাত কান পর্যন্ত ওঠিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। চতুর্থ তাকবির বলে হাত না উঠিয়েই রুকুতে চলে যেতে হবে। এরপর অন্যান্য নামাজের নিয়মেই নামাজ শেষ করে সালাম ফেরাতে হবে।

ঈদের নামাজ শেষে ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করবেন। জুমার খুতবার মতো এই খুতবা শোনা মুসল্লিদের জন্য ওয়াজিব। খুতবার সময় কথাবার্তা বলা, চলাফেলা করা, নামাজ পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারও ঈদের নামাজ ছুটে গেলে কিংবা যে কোনো কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় একাকী তা আদায় বা কাজা করার কোনো সুযোগ নেই। তবে চার বা তার অধিক লোকের ঈদের নামাজ ছুটে গেলে তাদের জন্য ঈদের নামাজ পড়ে নেয়া ওয়াজিব।

সূফি উদ্ধৃতি

■ কোন ব্যক্তি খাস দিলে কোন বস্তু প্রার্থনা করলে তাকে তা দান করে তার প্রতিদান তলব না করা হল শফকত (বা মানুষের প্রতি হামদরদী)।

■ যে দরবেশ আল্লাহর খুশীতে খুশী থাকেন তিনিই সেরা বোযর্গ।

■ যে ব্যক্তি উপকার করে ও মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে তার সোহবত গ্রহণ করবে।

■ যে ইলমের প্রহরায় এবং আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে থাকে তাকেই মুরীদ বলে।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ্)

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরকে যিনি পরিণত করেছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি ও কারুশিল্পের বেহেশতে
হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানী (রঃ)

● মোঃ মাহবুব উল আলম ●

১. জন্ম ও পরিচিতি :

কেবল মারেফাতের নূরানী জগতে নয়, সূফি দর্শন ও সাহিত্যে বিপুল অবদান রাখার পাশাপাশি কাশ্মীরের সংস্কৃতি এবং চারু ও কারু শিল্পের ভুবনে সুদূর প্রসারী প্রভাবের স্বাক্ষর রেখে যে মহান সূফি ব্যক্তিত্ব এখনো তাঁর কর্ম-কৃতির মাঝে গতিশীলভাবে অমর রয়েছেন, তাঁর নাম হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানী (রঃ)। এই মহান সূফি সাধক ও কর্মযোদ্ধা তাঁর অমর সৃজনশীলতার বদৌলতে বিশ্বখ্যাত দার্শনিক কবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের কবিতায়ও স্থান করে নিয়েছেন।

তাঁর পুরো নাম মীর সৈয়দ আলী বিন শাহাব উদ্দিন হামাদানী (রঃ)। জন্ম তাঁর পারস্যের হামাদানে ১৩১৪ ঈসায়ী সনে। ইন্তেকাল করেন ১৩৮৪ ঈসায়ী সনে বর্তমান পাকিস্তানের সোয়াতের কুনারে। তাঁকে সমাহিত করা হয় তাজিকিস্তানের খাতলানের কুলবে। এখানে রয়েছে তাঁর মাজার শরীফ। হাজার হাজার মানুষ এখনো আসেন এই মাজার জেয়ারতে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল তাজিক প্রধানমন্ত্রী আকিল আকিলভ ও অন্যান্য কর্মকর্তা সমভিব্যহারে তাঁর মাজার জেয়ারত করে গিলাফ অর্পন করেন।

ভারতের কাশ্মীরের শিল্প-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনে তাঁর ভূমিকা ও অবদান অনন্য। কাশ্মীরে ইসলামী চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, সাম্যনীতি, কল্যাণময়তাসহ সাধারণ মানুষের ঐহিক ও পারলৌকিক বিকাশেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

তাঁর লকব বা উপাধি অনেক। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আমির-ই-কবির, আলী সানী, শাহ-ই-হামাদান ও মীর। এছাড়াও বিভিন্ন বিবরণীতে তাঁকে কুতুব-ই-জামান, শায়খ-ই-সালিফান-ই-জাহান, কুতুব-উল-আকতাব, মহী-উল-আম্বিয়া-উল-মুরসালীন, আফজাল-উল-মুহাক্কীন ওয়া আকমল-উল-মুদাক্কীন, আল-শায়খুল কামীল, আকমল-উল-মুহাক্কীক-উল-হামাদানী প্রভৃতি।

হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানীর (রঃ) জন্ম এক সম্ভ্রান্ত আলোকিত পরিবারে। পৈতৃক-সূত্রে তাঁর বংশ লতিকা ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (রঃ) হয়ে হযরত আলী (কঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর পিতার নাম হযরত সৈয়দ শাহাবউদ্দিন (রঃ) এবং মাতার নাম সৈয়দা ফাতিমা (রঃ)। মাতৃসূত্রে তাঁর বংশলতিকা সপ্তদশ পুরুষ হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত প্রলম্বিত।

২. বাল্য জীবন, শিক্ষা ও মারেফতী তালিম :

শিক্ষার আলোয় আলোকিত পরিবারে জন্ম নেওয়া হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানী (রঃ) ছিলেন অতি মেধাবী, বুদ্ধিমান ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্ন। তিনি তাঁর মামা হযরত আলাউদ্দিনের (রঃ) তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেন। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে-পার্থিব-অপার্থিব, জাহেরী ও বাতেনী বিভিন্ন বিষয়ে মামার নিকট তালিম নেন। অতঃপর মামা তাঁকে বাতেনী জগতে যথার্থ তালিম লাভের জন্য হযরত শায়খ আবুল বরকতের (রঃ) তত্ত্বাবধানে অর্পন করেন। শায়খ আবুল বরকতের (রঃ) ইন্তেকালের পর তিনি সমকালীন প্রখ্যাত ওলী আল্লাহ্ হযরত শায়খ মাহমুদ মিজদিকানীর (রঃ) সমীপে আগমন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁকে কঠোর রিয়াজত করতে হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি ষড়রিপুর উৎপাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। মহান পীরের সান্নিধ্যে তিনি একজন দরবেশের উপযোগী সকল গুণে বিভূষিত হন।

তিনি কুবরাবিয়া ত্বরিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হযরত শায়খ আবুল মিয়ামিন নজমউদ্দিন মুহাম্মদ-বিন-মুহাম্মদ আজানী (রঃ) হতে খিলাফত লাভ করেন।

৩. বিভিন্ন দেশ সফর ও অভিজ্ঞতা অর্জন :

পর্যটক হিসেবে হযরত আলী হামাদানী (রঃ) অত্যন্ত মশহুর ছিলেন। তাঁর ওস্তাদ হযরত মাহমুদ মিজদিকানী (রঃ) তাঁকে বলেন, "তামাম দুনিয়া ঘোরো। ওলী-দরবেশদের সান্নিধ্যে যাও। তাঁদের কাছ থেকে যতো পারো জ্ঞান-সম্পদ ও ফায়দা আহরণ করো।" তিনি একটানা বিশ/একুশ বছর ধরে বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং তিনবার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। এই দীর্ঘ সফরকালে তিনি বিভিন্ন ইসলামী ও অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ঐসব দেশে মহৎ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

৪. কাশ্মীরে আগমন :

তাঁর স্বদেশে তখন দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং-এর দোর্দন্ড ঝড়ো বিচরণ চলছিল। তৈমুরের নিষ্ঠুরতা ও পীড়ন পরিহারের

উদ্দেশ্যে সাতশত অনুসারী সমভিব্যহারে ভারত বর্ষের কাশ্মীরে চলে আসেন। কাশ্মীরে তখন সুলতান শাহাবউদ্দিনের রাজত্ব। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার জন্য তিনি তাঁর দুই শিষ্য হযরত সৈয়দ তাজ উদ্দিন সামনানী (রঃ) এবং হযরত মীর সৈয়দ হাসান সামনানীকে (রঃ) প্রেরণ করেন। কাশ্মীরের শাসক হযরত মীর সৈয়দ হাসান সামনানীর (রঃ) বয়েত হন। বাদশাহর সম্মতিতে তিনি বিপুল সংখ্যক অনুসারী নিয়ে কাশ্মীরে আসেন। খোদ বাদশাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারী কুতুব উদ্দীন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে কাশ্মীরের শাসকের সাথে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ তোঘলকের যুদ্ধ চলছিল। হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানীর (রঃ) মধ্যস্থতা ও প্রয়াসে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত শাহ-ই-হামদান (রঃ) সুসংঘঠিত উপায়ে কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের কোণায় কোণায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁরা প্রচুর সংখ্যক মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐসব মসজিদের মধ্যে অন্যতম মশহুর মসজিদ ঝিলাম নদীর তীরে খানকায়ে মুয়াল্লা।

হযরত শাহ হামাদান (রঃ) কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি। তবে বিভিন্ন উপলক্ষে এই উপত্যকা সফর করেন। প্রথমবার তিনি সফর করেন ৭৭৪ হিজরী সনে সুলতান শাহাবউদ্দিনের সময় এবং এ সময় তিনি ছয় মাস অবস্থান করেন। দ্বিতীয় দফা আসেন সুলতান কুতুব উদ্দিনের সময়ে ৭৮১ হিজরী সনে। এ দফায় তিনি এক বছর অবস্থান করেন এবং কাশ্মীরের প্রত্যন্ত এলাকা সফরে সচেষ্ট হন। ৭৮৩ হিজরী সনে তিনি ৩য় দফায় কাশ্মীর সফর করেন ৭৮৫ হিজরী সনে। এ দফায় আরো দীর্ঘ সময় ধরে কাশ্মীরে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেও অসুস্থতার কারণে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

৫. ইন্তেকাল :

কাশ্মীরে তৃতীয় দফা সফর শেষে তিনি পিখানলী হয়ে সোয়াতের কুনারে আসেন এবং রাজকীয় অতিথি হিসেবে বরিত হন। সেখানে তিনি পাঁচ দিন অবস্থান করেন এবং ৭৮৬ হিজরীর ৬ জিলহজ্ (১৩৮৪ ঈসায়ী সনের জানুয়ারী) ইন্তিকাল ফরমান।

অগণিত সাধারণ মানুষের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি ও উন্নয়নে তাঁর বিপুল প্রভাব রয়েছে। তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীদের মধ্যে রয়েছেন : হযরত নুরুদ্দিনজাফর রুস্তাক বাজারী বদখশী (রঃ), হযরত খাজা ইসহাক খাতলানী (রঃ), হযরত শায়খ জ্বিয়াম উদ্দিন বখাশী (রঃ), হযরত মীর সৈয়দ হোসাইন সামনানী (রঃ), হযরত মীর রুকনুদ্দিন (রঃ), হযরত সৈয়দ ফখরুদ্দিন (রঃ), কুতুবে আমজাদ সৈয়দ মোহাম্মদ কোরেশী (রঃ), হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন শাহ (রঃ), হযরত সৈয়দ আহমদ কোরেশী (রঃ), হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজ উল্লাহ (রঃ), হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ মুরীদ (রঃ), হযরত পীর মোহাম্মদ কাদরী (রঃ)।

৬. কাশ্মীরের সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব

কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক অবয়ব বিনির্মাণে প্রথম কাতারের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের অন্যতম হযরত শাহ-ই-হামাদানী (রঃ)। এই উপত্যকার শিল্প-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে তাঁর প্রভাব বর্ণনাতীত। তাঁর সঙ্গে আগত সাতশত ভক্ত-অনুসারীদের অনেকেই ছিলেন চারু ও কারু শিল্পে পারদর্শী। তাঁরা শাল ও কার্পাস তৈরী, বস্ত্র বুনন, মৃৎশিল্প ও লিপিশিল্পে পারদর্শী ছিলেন। আল্লামা ইকবালের মতে, হযরত শাহ হামাদানীর বদৌলতে কাশ্মীরে চারু ও কারু শিল্পের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে এবং কাশ্মীর ছানী ইরানের রূপ পরিগ্রহ করে। এছাড়া কাশ্মীরি জনগণের চিন্তন প্রক্রিয়াও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বিশ্বব্যাপী সমাদৃত কাশ্মীরি শালের বিকাশ ঘটে এভাবেই। তিনি কাশ্মীরে যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করেন, তাতে শত শত বছর ধরে হাজার হাজার কাশ্মীরির কর্ম ও জীবিকার সংস্থান হচ্ছে। বহুমুখী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত শাহ হামাদানী (রঃ)। তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারকও বটেন। সাধারণ কাশ্মীরি জনগণকে বহু অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার পথ দেখিয়ে ছিলেন তিনি। কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার তাঁদের ঈমানের উন্নয়ন, উন্নতর চরিত্র বিনির্মাণে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা দিশারীর ভূমিকা পালন করে। তাঁর রচিত অন্যতম মূল্যবান পুস্তক 'জাখিরাতুল মালুব'-এর নবম অধ্যায়ে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সুলতানের আচরণের নীতি-নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুস্তকে প্রশাসনবিধি (সালতানাত ও বেলায়ত সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে মারিফাত জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ চিন্তা উদ্দীপক আলোচনা।

হযরত হামদানী (রঃ) কাশ্মীরে মধ্য এশীয় স্থাপত্য-শৈলী প্রবর্তন করেন। তবে তা নবতর রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। কাশ্মীরের 'খানকায়ে মুয়াল্লা' এর অনুপম নির্দশন। এই স্থাপত্য-কীর্তি তাঁর স্মরণে নিবেদিত। এই ইমারতের মধ্যে ঐ কক্ষটিও রয়েছে, যেখানে তিনি তাঁর প্রথম কাশ্মীর সফরের সময়ে অবস্থান করেছিলেন। কাশ্মীরে কাষ্ঠনির্মিত গৃহাদির এটা সুন্দর একটা নমুনা বটে। এর দেওয়ালে রয়েছে

দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য। এই ইমারত ছিল সুলতান কুতুব উদ্দিনের এবং সরকারী সরাইখানা হিসেবে তা ব্যবহৃত হতো। এখানে প্রতি শুক্রবারে জুমার নামায আদায় করা হয়।

খানকায়ে মুয়াল্লায় অনেক পবিত্র স্মৃতি-নিদর্শন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো হযরত মুহাম্মদের (দঃ) পতাকা এবং তাঁর তাঁবুর একটি খুঁটি। সুলতান সিকান্দারের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে তাঁর পুত্র হযরত মীর সৈয়দ মোহাম্মদ হামাদানী (রঃ) এই খানকা তৈরী করেন। একটি হরিণের চামড়ার উপর এই বিক্রয় কবলা এখনো এ খানকায় সুরক্ষিত রয়েছে। তাঁর কর্ম, নীতি-আদর্শে বিমুগ্ধ হয়ে প্রায় ৩৭ হাজার লোক তাঁর হাতে বয়েত গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরে তাঁর পুত্র সুলতান সিকান্দরের রাজত্বকালে কাশ্মীরে দীর্ঘ ১৮ বছর অবস্থান করেন এবং তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর বংশধরদের একটা অংশ এখনো কাশ্মীরে বসবাস করেন। কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ বিশেষ এবং তাজিকিস্তানে এখনো তিনি অতীব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

ঐতিহাসিক এক চিনার বৃক্ষ :

কাশ্মীরের বাদগাম জিলার চাদুরাস্থ চতরগামে ৬৩৮ বছর বয়সেরও বেশী সময়ের একটি চিনার গাছ রয়েছে। পৃথিবীতে এটাই হচ্ছে প্রাচীনতম চিনার গাছ। জনশ্রুতি রয়েছে যে, হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানী (রঃ) ১৩৭৪ ঈসায়ী সনে এই বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন।

হযরত মীর সৈয়দ আলী হামাদানীর (রঃ) রচনাবলী

হযরত শাহ হামাদানী (রঃ) কেবল একজন সূফি দরবেশ ছিলেন না, তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানীও ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত তাঁর শতাধিক প্রচারপত্র রয়েছে। বহুভাষায় অনুবাদিত জাখিরাতুল মূলূক' তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

তাঁর পুস্তকগুলো হচ্ছে : (১) জাখিরাতুল মূলক (রাজনৈতিক নীতি শাস্ত্র ও সু-শাসনের বিধি-বিধান সংক্রান্ত পুস্তক), (২) রিসালা নূবিয়াহ (মোরাকাবা-মোশাহাদা সংক্রান্ত পুস্তক, (৩) রিসালা মকতুবাত (আমীর-ই-কবির-এর পত্রগুচ্ছ), (৪) দুর-মারিফাতি সুরত ওয়া সিরাত-ই-ইনসান (মানুষের শারীরিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক গ্রন্থ), (৫) দুর হাকিকী তওবা (তওবার প্রকৃত স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা, (৬) হাল্লি নুসুমী আল্লাল ফুসুস (হযরত ইবনুল আরাবীর (রঃ) ফুসুসুল হিকাম-এর ভাষ্য), (৭) শরবী ক্বসিদা খামরিয়া ফারিজিয়া (উমর ইবনুল ফারিজের শারাব-কসিদার উপর ভাষ্য। উমর ইবনুল ফারিজের মৃত্যু হয় ১৩৮৫ ঈসায়ী সনে), (৮) রিসালাতুল ইসতালাহাত (সূফি শব্দ ও পরিভাষা কোষ), (৯) ইলমুল ক্বিয়াফা বা রিসালাহ-ই-ফিয়াফা (ফিজিওনোমি বা মুখাবয়ব দেখে চারিত্রিক গুণাবলী নির্দেশ করার বিদ্যা। এই পুস্তকের একটা কপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী অব মেডিসিন-এ রক্ষিত আছে, (১০) দাহ্ কায়দাহ্ (ধ্যানী জীবনের দশ নিয়ম), (১১) কিতাবুল মাওদা ফিল্ কুরবা (আত্মীয়বর্গের মধ্যকার স্নেহ-মমতার ঐতিহ্যের সংকলন), (১২) কিতাবুস সাবিনা ফি ফযায়েলে আমিরুল মুমিনিন (হযরত আলী (ক) এর ৭০ টি গুণাবলীর বিবরণ, (১৩) আরবায়িনা আমিরিয়া (মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ৪০টি ঐতিহ্য বা বিশ্বাস, (১৪) রওয়াতুল ফিরদৌস (সিরাজুদ্দিন শিরুয়্যা রচিত বৃহদাকার পুস্তক ফিরদৌসুল আখিয়ার থেকে উদ্ধৃতি, (১৫) মঞ্জিল ইনসালিফিল (সূফিবাদ বিষয়ক গ্রন্থ), (১৬) আওরাদ-উল-ফাতেহাত (আল্লাহ্র তৌহিদ ও সিফতের ধারণা সম্পর্কিত গ্রন্থ), (১৭) চেহেল আসরার বা চল্লিশ গুপ্ত রহস্য, চল্লিশটি হামদ ও না'ত-এর সংকলন)।

সূত্র : ইন্টারনেট

অনুবাদ : মোঃ মাহবুব উল, আলম

সূফি উদ্ধৃতি

■ কোন দরবেশকে ধনী লোকের কিংবা বাদশাহের প্রতি অনুরক্ত দেখিলে মনে করিবে যে, সে দরবেশ নহে, বরং রিয়াকার এবং চোর।

■ চটের পোশাক পরিধান করা এবং যবের রুটি খাওয়ার নাম যোহদ্ বা সংসার বিরাগ নহে; বরং অন্তঃকরণকে দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ না করা এবং আশা ও কামনাকে খাটো করার নাম সংসার বিরাগ।

– হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাহ্)

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্

● হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী ●

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্ হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী (রহঃ) (১৮৮০-১৯৮৫ইং) রচিত একটি সুলিখিত গ্রন্থ। লেখক একজন উঁচু ধরণের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। মুসলমান তথা সমগ্র মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ওয়াজ ও লেখনির মাধ্যমে তাঁর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগীতে আল্লাহর দিকে অবিরত দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি পবিত্র কালামের ৯৪ তম সূরা আলাম নাশরাহ্ এর সূফিয়ানা তফসির পেশ করেছেন। সম্মানিত গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর অনুসৃত বানান ও বাক্যগঠন পদ্ধতি হুবহু বজায় রেখে আমরা তা এখানে প্রকাশ করছি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোকটির বর্ণনা শ্রবণ করিয়া হজরত ইছা (আঃ) অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এইভাবে কত বৎসর যাবৎ আল্লাহ তাআলার এবাদত করিতেছেন?" লোকটি জওয়াব দিলেন, "আনুমানিক দুই শতাধিক বৎসর যাবৎ আমি এই কুব্বার মধ্যে থাকিয়া আল্লাহর এবাদত করিতেছি বলিয়া বোধ হয়।" অতঃপর তিনি ইছা (আঃ) কে ছালাম দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কুব্বার দরওয়াজা বন্ধ হইয়া গেল। তখন হযরত ইছা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করিলেন, "এয়া আল্লাহ! আপনার মো'মেন বান্দাহগণের মধ্যে অন্য এমন কোন বান্দাহ আছে কি, যিনি সংসার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া এবং পায়খানা প্রস্রাব ও ঘুম হইতে মুক্ত থাকিয়া দিবানিশি দুই শতাধিক বৎসরকাল আল্লাহ তাআলার এবাদত করিয়াছেন?" আল্লাহ তাআলা জবাব দিলেন, "এয়া ইছা (আঃ)! আমি যে আমার হাবিব আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) কে সব নবীগণের শেষে খাতেমুন নবীয়ীন করিয়া পাঠাইব। তাঁহার কোন একজন সত্যিকার উম্মত যদি (শবে বরাতে) শাবান চাঁদের চৌদ্দ তারিখ সূর্য্যাস্তের পর হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত নমাজ, তেলাওয়াৎ এ কোরআন দরূদ ছালাম পাঠ, জিকর তছবীহ তাহলীল কবর জেয়ারত, খয়রাত, ছদকা দান ইত্যাদি ছওয়াবজনক এ'বাদতে মশগুল থাকেন, তবে তিনি মুছা (আঃ) এর এই উম্মতের দুই শতাধিক বৎসরের এ'বাদতের ছওয়াব অপেক্ষা অধিক ছওয়াব পাইবেন।" ইছা (আঃ) ইহা শুনিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করিলেন, "এয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে নবী করিলেন কেন? মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত করিলেন না কেন? আমাকে মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতের মধ্যে গণ্য করুন।" আল্লাহ তাআলা বলিলেন, "নবী মা'জুল কিংবা পদচ্যুত হইতে পারেন না। এক নবী অন্য নবীর উম্মৎ হইতে পারেন না। তবে আমি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিব। শেষ জমানার খাতেমুল ওলি ঈমাম মাহদি (আঃ) এর সঙ্গে যখন দাজ্জাল মলউন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে; তখন আপনাকে মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতের সাহায্যকারী আনছার-এ-মাহদিরূপে দুনিয়ায় পাঠাইব। অতঃপর আল্লাহ তাআলার নিজ অসীম কুদরতে হজরত ইছা (আঃ) কে চতুর্থ আছমানে এ যাবৎ জীবিত রাখিয়াছেন। উম্মত-এ-মোহাম্মদীর খাতেমুল ওলি, ইমাম মাহদি (আঃ) যখন দাজ্জালের সহিত জেহাদে মশগুল থাকিবেন, সেই সময় আল্লাহ তাআলা হযরত ইছা (আঃ) কে তাঁহার নিকট পাঠাইবেন এবং হজরত ইছা (আঃ) ইমাম মাহদি (আঃ) এর সহিত মিলিত হইয়া জেহাদে অগ্রসর হইবেন আর দাজ্জাল মলউনকে নিহত করিবেন। এই বৃত্তান্ত ইতিপূর্বেও লিখিত হইয়াছে। ইমাম মাহদি আলায়হেচ্ছালাম, রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উম্মতগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্ব প্রধান ওলি এবং খলিফা। দাজ্জাল মলউন তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। হজরত ইছা (আঃ) অবতরণ করিয়া দাজ্জালকে নিহত করিবেন। ইহা সমুদয় উম্মত এ মোহাম্মদী বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করেন ও ঈমান রাখেন। ইছলামী আকায়েদের সমুদয় কেতাবে এবং বহু ছহি হাদিছে ও কোরআনের তফছীরে উক্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কেহ যদি জহুরে মাহদি (আঃ), খুরুজে দাজ্জাল মলউন ও নুজুলে ইছা (আঃ) "হক" বলিয়া বিশ্বাস না করে, তবে সে উম্মত-এ মোহাম্মদী হইতে খারিজ বলিয়া ইছলাম জগতে "বিল এজমা" ফৎওয়া" হইয়াছে। ইমাম মাহদি (আঃ) কে উম্মত এ মোহাম্মদীর খাতেমুল ওলি বলিয়া যে মানে না, সেও তদ্রূপ উম্মত-এ-মোহাম্মদী হইতে খারিজ।

হজরত ইছা (আঃ) এখনো জীবিত আছেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্বে কোরআনের আয়েতের দ্বারা সুপ্রমাণ লিখিয়াছি। কেহ যদি ইছা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া বলে সেও তদ্রূপ উম্মত-এ-মোহাম্মদী হইতে খারিজ। নবীগণের মো'জেজা ও ওলিগণের কারামাৎ "হক" বলিয়া ঈমান

রাখিতে হইবে। কেহ যদি মো'জেজা ও কারামাৎকে অবিশ্বাস করে, তবে সে বেঈমান। দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকার পর মাহদি (আঃ) এর খেলাফতের সময় অবতরণ করিয়া জেহাদে দাজ্জালকে কতল করা ইছা (আঃ) এর মোজেজা বিশেষ। আর সমুদয় কাফেরগণের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত শক্তিবলে জেহাদ করিয়া জয়ী হওয়া ইমাম মাহদি (আঃ) এর কারামাৎ বিশেষ।

আল্লাহ তাআলা আবাবিল পক্ষীর দ্বারা কঙ্কর নিক্ষেপ করাইয়া আব্রাহার হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করিয়াছেন।[১২]

নমরুদ বাদশাহ অগণিত সৈন্য বাহিনী লইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সম্মুখীন হইয়া বলিয়াছিল, "হে ইব্রাহিম! তোমার আল্লাহর সৈন্যদল কোথায়? তাহাদিগকে আমার সম্মুখীন হইতে বল" তখন আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম (আঃ) এর মোজেজা রূপে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা পাঠাইয়া নমরুদ ও তাঁহার সৈন্য বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) এর মো'জেজা রূপে আল্লাহ তাআলা তাঁহার হস্তের দ্বারা যে কংকর নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন, তদ্বারা কাফের সৈন্যগণের প্রত্যেকের দুই চক্ষে সেই কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহারা দিশাহারা হইয়া আহত ও পরাজিত হইয়াছিল। হজরত আলী (কঃ) এর হাতের দ্বারা খাইবরের কেল্লার অতি বড় ভারী দরওয়াজা ভাঙ্গাইয়া মোছলেম বাহিনীকে জয়ী করিয়াছিলেন। খালেদ ইবনে অলিদ (রঃ) হজরত রছুলে করিম (দঃ) এর চুল মোবারক নিজ টুপির ভিতর সসম্মানে ও সযত্নে সেলাই করিয়া দিয়া সেই টুপি মাথায় দিয়া জেহাদে গমন করিতেন; তখন তিনি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান হইতেন। কথিত আছে যে, মছায়েলেমা কাজ্জাব বিদ্রোহী হইয়া খলিফাতুল মোছলেমীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, খালেদ (রঃ) অশ্বারোহনে বিদ্যুৎবেগে তাহার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিয়া গিয়া সৈন্যের মধ্যস্থলে তাহাকে ধরিয়া ভূপাতিত করতঃ জবেহ করিতে উদ্যত হইলে, সে তওবা করিয়া পানাহ চাহিলে খালেদ (রঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে রক্ষা পাইয়া দ্বিতীয় বার পুর্ণোদ্যমে মোছলেম বাহিনীকে আক্রমণ করে। খালেদ (দঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধেও আগেকার মত তাহার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিয়া গিয়া, তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া জবেহ্ করিতে উদ্যত হইলে, সেইবারও সে অধিকতর কাকুতি মিনতি করিয়া সত্য সত্যই তওবা করিতেছে বলিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিলে, খালেদ (রঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে এইরূপ মুনাফেকি করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া তৃতীয়বার যথাসাধ্য যুদ্ধের আয়োজন করতঃ মোছলেম বাহিনীকে আক্রমণ করে। তখন খালেদ (রঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, সে অতি মোনাফেক। সুতরাং তাহাকে এইবার নিশ্চয়ই কতল করিতে হইবে। তিনি এইবার পূর্ণ তেজে অশ্বারোহ করতঃ বজ্র নিনাদে "আল্লাহো আকবর" তকবির বলিয়া হাজার হাজার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করতঃ বিজলীর মত গিয়া মোছায়েলেমা কাজ্জাবকে ধরিয়া ফেলিয়া, যখন যবেহ্ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে অত্যন্ত কাতরতা দেখাইয়া এবং বহু কছম করিয়া বলে, "আমি এইবার সত্য সত্যই তওবা করিয়া ঈমান আনিলাম; দয়া করিয়া আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দান করুন।" তখন খালেদ (রঃ) "কাজ্জাবতা ইয়া মুনাফেক" বলিয়া তাহাকে কতল করিলেন। মোছলেম বাহিনী জয়ী হইলেন। খালেদ (রঃ), খলিফা আবু বকর (রঃ) এর সমীপে হাজির হলে, কয়েক জন আছহাব তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, মোছায়েলেমা তওবা করিয়া ঈমান আনা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে "কাজ্জাবতা ইয়া মোনাফেক" অর্থাৎ "হে মোনাফেক, তুমি অতি মিথ্যুক" বলিয়া কতল করিয়াছেন। মোশ্‌রেক বা কাফের ঈমান আনিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিলে, তাহাকে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া কোরআনের আদেশ। খালেদ (রঃ) মোছায়েলেমাকে পানাহ না দিয়া কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করতঃ মোমেনকে কতল করিয়াছেন। সুতরাং "কেছাছ" স্বরূপ খালেদ (রঃ)ও এইরূপ মত দেন। তখন আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) আল্লাহ তাআলার রহমতে দিব্যজ্ঞানে সঠিক জওয়াব দেন যে, মোছায়েলেমা দুই বার ঈমান আনিয়া পুনরায় মোনাফেকি করিয়াছে। সুতরাং সে যে খাঁটি মোনাফেক তাহা খালেদ (রঃ) নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়া তৃতীয় বার ঈমান আনা সত্ত্বেও তাহা মোনাফেকী মৌখিক ঈমান বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে কতল করিয়াছেন। অতএব খালেদ (রঃ) মোনাফেককে কতল করিয়াছেন, মো'মেনকে নয়। সুতরাং তিনি শাস্তি পাইতে পারেন না বরং পুরস্কার পাইতে পারেন। এই সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) সমস্ত আছহাবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, لقد كرمنا بنى ادم অনুবাদঃ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আদম (আঃ) এর আওলাদকে অর্থাৎ মানব জাতিকে যাবতীয় সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছি। (কোরআন)।

মানব জাতির মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। যথা– আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, كنتم خير امة অনুবাদঃ হে উম্মত-এ মোহাম্মদীগণ। তোমরা অন্যান্য সকল নবীগণের উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (কোরআন)।

নবীগণের মধ্যে মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে কোরআনে মজিদে "খাতমন্নবীঈন" ও "রাহমতুল্লিল আ'লামিন" আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার শানে বলা হইয়াছে, [illegible] অনুবাদঃ এয়া মোহাম্মদ (দঃ)! আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তাঁহার পর আপনি সবচেয়ে বড়। ইহাই আপনার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশংসা।

আমরা ইতিপূর্বে লিখিয়াছি যে, কা'বা গৃহ ধ্বংসে প্রয়াসী আবরাহার সৈন্য বাহিনীকে আল্লাহ তাআলা আবাবিল পক্ষী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কংকররাশি দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়াছিলেন, মশা দ্বারা নমরুদের বিরাট সৈন্য বাহিনীকে নিহত করিয়াছিলেন; হজরত আলী (কঃ) এর দ্বারা খায়বরের কেল্লার দরওয়াজা ভাঙ্গাইয়াছিলেন; রছুল (দঃ) কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কংকররাশি দ্বারা কাফেরগণের বহু সৈন্যকে হতাহত ও পরাজিত করিয়াছিলেন; সেনাপতি খালেদ (রঃ) তাঁহার অলৌকিক বীরত্বের দ্বারা সারা পৃথিবীর রাজা বাদশাহগণের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। অতএব শেষ জমানায় আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ ওলী ইমাম মাহদি (রঃ)এর অলৌকিক শক্তি ও করামাতের দ্বারাও পৃথিবীর সমুদয় কাফের সম্রাটগণকে পরাজিত ও অধীনস্থ করাইবেন বলিয়া বহু ছহী হাদিছে স্পষ্টরূপে এবং কোরআন-এ-মজিদে এশারায় যেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহা সত্যে পরিণত হইবে বলিয়া ঈমান রাখা একান্ত দরকার।

এটমবোম্ব, হাইড্রোজেন বোম্ব, মেশিনগান ইত্যাদি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক অস্ত্রাদির উপকরণ সমূহ আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে ঐসব বৈজ্ঞানিক অস্ত্রসমূহকে অকর্মণ্য করিয় দিতে পারেন। বজ্রকে ইমাম মাহদি (আঃ) এর হুকুমের বাধ্য করিয়া দিয়া তদ্বারা আল্লাহর নাফরমানগণের সমুদয় বৈজ্ঞানিক অস্ত্রকে অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ, রছুল (দঃ) ও আউলিয়া (রাঃ) এর আশেক মুছলিম জেহাদকারীগণের বজ্র সদৃশ "আল্লাহো আকবর" তকবিরের বিশ্ব-ত্রাসি হুংকার হইতে বিদ্যুৎ ছুটাইয়া কাফেরগণের সৈন্যদলে অগ্নিবর্ষণ করাইতে পারেন; "আল্লাহো আকবর" তকবিরের দাপটে ভূমিকম্প, সাইক্লোন (Cyclone), টর্ণেডো (Tornado) ও নুহ নবীর জমানার বন্যা সদৃশ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে আত্মশক্তি ও বৈজ্ঞানিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নাস্তিক বেঈমানগণকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংশ করিতে পারেন।

সুতরাং "হে আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল জড়বিজ্ঞানের উপাসক বিলাসী, লোভী, কামুক, পরশ্রীকাতর, হিংসুক, পরস্ব অপহরণকারী, জুয়াচোর, চোর, ডাকাত, প্রভুত্বকামী, স্বার্থপর, মদ্যপায়ী, পশুত্ব ও শয়তানী ভাবাপন্ন জালেমগণ! সাবধান!! অতীতের ইতিহাস স্মরণ কর। নুহ নবীর অভিশাপে কিরূপে সমগ্র পৃথিবীর কাফেরগণ জলমগ্ন হইয়া মরিয়া জাহান্নামে গিয়াছে এবং মো'মেনগণ নুহ নবীর কিস্তীতে আশ্রয় গ্রহণ করায়, পরম সুখে জীবনযাপন করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছেন।

ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হইতে কিভাবে বাঁচিয়া আসিয়া কাফের নমরূদকে সদলবলে ধ্বংশ করিয়াছেন। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় স্বর্গবাসী হওয়ার লালসায় কাফের শদ্দাদ বাদশাহ সারা দুনিয়া লুন্ঠন করতঃ তদ্বারা বেহেশত নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করার আশায় মহা আড়ম্বরে তদীয় কৃত্রিম স্বর্গের দরজায় উপনীত হইলে, ঘোড়া হইতে নামার সময় হযরত আজরাইল (আঃ) তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। সে তখন মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করতঃ কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদিয়া আজরাইল (আঃ) কে বলিল, "আমি আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনিলাম। আমাকে কিছুকালের জন্য জীবন দান করা হউক। আমি আল্লাহর পথে ছদকা করিব এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পুন্যবান হইব।" আজরাইল (আঃ) বলিলেন, "তোমার রূহ কবজ করার হুকুম হইয়াছে, সুতরাং তোমাকে আর এক মুহূর্তের জন্যও অবসর দেওয়া হইবে না।" তারপর সে প্রার্থনা করিল, "আমাকে ঘোড়ার রেকাব হইতে পা নামাইয়া জমির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেওয়া হউক।" আজরাইল (আঃ) বলিলেন, "তাহাও দেওয়া হইবে না।" অতঃপর শদ্দাদ বলিল, "আমাকে একবার নিঃশ্বাস ফেলিতে দেওয়া হউক।" আজরাইল (আঃ) তাহাও দেওয়া হইবে না বলিয়া তাহার রূহ কবজ করিলেন। তখন শদ্দাদ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর তাহার সৈন্য সামন্ত জানিতে পরিল যে, তাহাদের বাদশাহ শদ্দাদ মরিয়া গিয়াছে। তাহার বেহেশ্‌ত দেখার সাধ পূর্ণ হইল না।

ফুটনোটঃ ১২. তখন মোহাম্মদ (দঃ) মাতৃগর্ভে ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁহার কেবলা, কা'বা গৃহকে রক্ষা করার জন্য এই মো'জেজা ব্যক্ত করেন। ইহা রছুল (দঃ) এর এরহাছ শ্রেণীর মো'জেজা বিশেষ। দুনিয়ায় নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কোন নবী হইতে মো'জেজা জাহির হইলে তাহাকে "এরহাছ" বলে।

মহিমামণ্ডিত রজনী লাইলাতুল কদর মোবারক

● অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ●

পটভূমিকা: আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহু কতেক বস্তুকে কতেকের উপর মহিমামণ্ডিত ও নেতৃত্ব দান করেছেন। যেমন: মানবজাতীর সর্দার হলেন হযরত আদম (আঃ) বিশ্ব জগত এর সর্দার হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইরানীদের সরদার হলেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। রুম বাসীর সর্দার হলেন হযরত সুহাইব (রঃ)। হাবস এর অধিবাসীদের সর্দার হলেন হযরত বেলাল (রাঃ)। ফিরিস্তাদের সর্দার হলেন হযরত জিব্রাইল (আঃ)। শহর সমূহের সর্দার হলো মক্কা মুকাররমা। মফস্বল অঞ্চল গুলোর সর্দার হলো বাইতুল মুকাদ্দাস। কিতাব সমূহের সর্দার হলো কুরআনুল করীম। সূরা বাকারার সর্দার হলো আয়াতুল কুরসী। পাথর সমূহের সর্দার হলো হাযরে আসওয়াদ। কূপ সমূহের সর্দার হলো জমজম কূপ। লাঠি সমূহের সর্দার হলো হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠি (আসা)। মাছ সমূহের সর্দার হলো ঐ মাছ যেটির পেটে হযরত ইউনুচ (আঃ) ছিলেন। উট সমূহের সর্দার হলো হযরত সালেহ (আঃ) এর উটনী। সওয়ারী বা বাহন সমূহের সর্দার হলো বোরাক। আংটি সমূহের সর্দার হলো হযরত সুলায়মান (আঃ) এর আংটি। মাস সমূহের সর্দার হলো রমযানুল মুবারক। দিবস সমূহের সর্দার হলো জুমার দিন। রাত সমূহের সর্দার হলো কদরের রাত বা লাইলাতুল কদর। কুরআনে করিমে এ মহিমাময় ভাগ্য রজনীর বর্ণনা করতে গিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা বিদ্যমান আছে। এর নাম করণও করা হয়েছে সূরা আল কদর।

লাইলাতুল কদরের নামকরণ: এটি একটি রাতের নাম। আরবীতে রাতকে বলা হয় লাইলাতু আর ফারসী ভাষায় বলা হয় শব। তাই বহু প্রাচীনকাল থেকে এ রাত্রিকে ভারতবর্ষ ইরান সর্বস্থানে শবে কদর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেহেতু এ রাতটি সম্মানিত ও মর্যাদাবান তাই এটাকে কদর (সম্মান) নামকরণ করা হয়েছে। কেননা এ রজনীতে আগত এক বছর কালের ঘটমান সর্ব বিষয়ে একটা প্রকল্প তৈরী করা হয় যেটাকে ইংরেজীতে Budget (বাজেট) কিংবা Planning বলা হয়।

উক্ত রজনীতে রাসুলে আকরম (দঃ) এর নিকট কুরআনে করিমের পূর্ণভাব একই সময়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে বিধায় এটি অতীব মহিমামন্ডিত বা কদর সম্পন্ন হয়েছে। তদুপরি উক্ত রাতের সূচনা হতে পরদিন ভোর পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে অবারিতভাবে আল্লাহর বান্দার উপর কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। তাই এটা কদর ওয়ালা বা সম্মানজনক রাত্রি। কোন কোন মণীষী এ রজনীকে আদেশ প্রদানের রাত্রিও বলেছেন। রাতভর ফিরিস্তাগণ ইবাদতকারীর উপর সালাম প্রদান করে থাকেন যা নবীগণের প্রাপ্য।

এ রাতের তাৎপর্য: এ রাত ব্যতীত অর্থাৎ এ ধরণের মহিমাময় রজনী থাকেনা এমন হাজার রাতের আমল ইবাদত বন্দেগীর চাইতেও ঐ লাইলাতুল কদরের এক রাত্রির ইবাদত বন্দেগী ও আমল সর্বাধিক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ليلة القدر خير من الف شهر লাইলাতুল কদরে খাইরুম মিন আলফে শহর। অর্থাৎ লাইলাতুল কদর বা কদরের রজনী এ সহস্র মাসের দিবস ও রজনী হতে উত্তম। এ ধরণের ঘোষণা শুনে সহাবা-এ-কিরামদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তাঁরা এমন খুশী হলেন যে অন্য কোন কথায় এমনতরো খুশী হন নি।

এ রজনীতে স্বয়ং হযরত জিব্রাঈল ফিরিস্তা (আঃ) অগণিত ফিরিস্তা সমভিব্যহারে আকাশ হতে এ ধূলির ধরায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। ঐ সকল ফিরিস্তা সিদরাতুল মুনতাহাতে অবস্থান করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এদের সংখ্যা সত্তর হাজার বলেছেন। তাঁরা নূরের পতাকা নিয়ে আসেন। ঐ পতাকা পৃথিবীর চার স্থানে পুঁতে দেন। (১) কাবা শরীফের উপর, (২) রাসুলে পাক (দঃ) এর রওজা শরীফের উপর, (৩) বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর, (৪) তুর সিনা পর্বতের মসজিদের পাশে।

অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সকল ফিরিস্তার উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়। যেখানে কোন মুমিন বান্দার উপস্থিতি থাকে; সকল ইবাদতকারী মুমিন নরনারীর ঘর-বাড়ীতে, মসজিদ-ইবাদতখানাতে ফিরিস্তারা প্রবেশ করে থাকেন। উক্ত মহিয়ান-গরিয়ান রজনীতে যারা জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী, নামাজ-জিকির, মীলাদ-কিয়াম, দোয়া-মুনাজাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকেন তাদের সঙ্গদান করে ফিরিস্তারা তাদের সাথে সুর মিলিয়ে জিকির-দরুদে অংশ নেন। তাদের দোয়া মুনাজাত, সকল চাওয়া-প্রার্থনার ফিরিস্তি আল্লাহর দরবারে কবুল করানোর লক্ষ্যে তারা আমিন আমিন বলে সর্ব ইবাদত মহা প্রভূর দরবারে গ্রহণ যোগ্য করে তোলেন।

মাঝে মাঝে ফিরিস্তারা ইবাদতকারীর জিকির আজকার,

দোয়া-মুনাজাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে হাতে হাত ধরে মুসাফিহা করে থাকেন, তাতে অজ্ঞাত এক অনুভূতি থেকে ইবাদতকারীর হৃদয় হতে কান্না এসে যায়, চোখ হয়ে যায় সজল, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। অন্তর নরম হয়ে যায়, অনেকে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। নিজের কৃত অপরাধের জন্য অশ্রুভরা কণ্ঠে খোদার দরবারে তওবা করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমতাবস্থায় তার দোয়া অবশ্যই আল্লাহর দরবারে গ্রাহ্য ও কবুল হয়ে থাকে। ফিরিস্তারাও ইবাদতকারীদের জন্য গুনাহ মাফ চাইতে থাকেন। তাতে আল্লাহর ক্ষমা নিশ্চিতভাবে ইবাদতকারী মুমিন নর-নারীর ভাগ্যে জুটে যায়।

শবে কদর বা সম্মানিত রজনীর সমাপনী মুহূর্তে প্রত্যুষে যখন সকল ফিরিস্তা আপন আবাস স্থলে ফিরে যান তখন তথাকার অন্যান্য ফিরিস্তারা তাদেরকে পূর্বরাত্রিতে কোথায় অবস্থান করছিল মর্মে প্রশ্ন করেন তাতে তারা জবাবে বলেন যে, আমরা উম্মতে মুহাম্মদীর পাপমার্জনা ও তাদের দোয়া কবুল করানো ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অদ্য শবে কদরে তাদেরকে সঙ্গ দিয়ে রাত্র অতিবাহিত করেছি। তাতে আল্লাহ পাক অসীম করুণাবারি দ্বারা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের পক্ষে আমাদের সুপারিশ কবুল করে নিয়েছেন। এ সংবাদ শুনে ফিরিস্তাগণ আল্লাহর শুকরিয়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকেন ও আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকেন।

এভাবে ফিরিস্তারা যখন ক্রমান্বয়ে উর্ধাকাশে পাড়ি জমান তখন আকাশবাসী সকল ফিরিস্তা এত মধুর আওয়াজে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তাদের ঐ শব্দ বেহেস্ত হতে বেহেস্তান্তরে ধ্বনিত হতে থাকে। অবশেষে ঐ প্রকাশের ধ্বনি আল্লাহর আরশ আজীম এ পৌঁছে যায়। স্বয়ং আরশ আজীমও আল্লাহর শুকরিয়া, পবিত্রতা, আল্লাহর একত্ববাদের প্রকাশ ও প্রশংসা করতে থাকে। একপর্যায়ে আল্লাহ পাক আরশকে তার প্রফুল্ল হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন; আরশ জবাবে বলে, হে আল্লাহ আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে যে, আপনি গত রাত লাইলাতুল কদর এ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেককার বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে বদকার লোকদের পক্ষে নেককার লোকদের সুপারিশ কবুল করেছেন, সে কারণে আমরাও আনন্দ প্রকাশ করছি, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাতে আল্লাহ পাক বলেন, ওহে আমার আরশ! তুমি সত্য বলেছ, আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের জন্য আমার এখানে এতো মহা পরিমাণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যে, এ ধরণের কেউ কোন চক্ষুদ্বারা দেখেনি, না কেউ কোন কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেছে, না কেউ কোন হৃদয় দ্বারা ধারণা করতে পেরেছে। (আলহামদুলিল্লাহ)

যাদেরকে অগ্রাহ্য করা হয় তারা হলো, ১. সদা মদ্যপায়ী। ২. মাতা-পিতার অবাধ্য। ৩. রক্ত সম্পর্ক আত্মীয়ের সম্পর্কচ্ছেদকারী। ৪. হিংসুক যে অপর মুমিনের সাথে তিন দিনাধিক কথা বলেনা। ৫. পরনিন্দুক। ৬. যাদুকর। ৭. ব্যভিচারী। তবে তওবাকারী মুক্তি পাবে।

এ মহিমাময় রজনী প্রদানের প্রেক্ষাপট: প্রিয় নবী রাসুলে মকবুল (দঃ) একদা সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে সংবাদ দিলেন যে, বনী ইসরাইলের সামউন নামক এক ব্যক্তি হাজার মাস ব্যাপী কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সশস্ত্র হয়ে সংগ্রাম অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। এ কথা শুনে সাহাব-এ-কিরাম আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা এতো স্বল্প আয়ু নিয়ে কী ভাবে অত বড় সম্পদ অর্জন করতে পারবো?

অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসুলে পাক (দঃ) সাহাবয়ে কিরামের নিকট একদিন বনী ইসরাইলের চার জন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করলেন যে, তাঁরা আশি বছর ধরে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন, ক্ষণিকের তরেও তাঁরা কোনরূপ আল্লাহর নাফরমানী করেন নি। অর্থাৎ এ দীর্ঘ সময়ের ইবাদত-বন্দেগী ছিল সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত। পুনরায় চার জন সম্মানিত নবীর নাম উল্লেখ করলেন, ১. হযরত আইউব (আঃ)। ২. হযরত যাকারিয়া (আঃ)। ৩. হযরত খরকীল (আঃ)। ৪. হযরত ইউশা বিন নূন (আঃ)। এতদশ্রবণে সাহাবাগণ রিদওয়ানুল্লাহ তা'আলা আলাইহিম অবাক হয়ে গেলেন।

ঠিক তখনি হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে রাসুলে আকরাম (দঃ) কে বল্লেন যে, আপনার ইম্মি পূর্বের বর্ণনা শুনে আপনার সাহাবারা আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন; এতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করেছেন আর তা হলো কদরের রাত্রি। এই বলে জিব্রাঈল (আঃ) সূরা ক্বদর সম্পূর্ণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবী করিম (দঃ) কে পাঠ করে শুনালেন। এতে রাসুল (দঃ) আনন্দিত হলেন। এ রজনীতে যে নেক ইবাদতই করা হোক না কেন তা আল্লাহর নিকট খুবই মর্যাদাবান ও সম্মানিত হয়ে থাকে।

কদর রাতের সন্ধানে: এ মহিমান্বিত রজনীর সন্ধানে ইসলামী মনীষীদের অধ্যবসায়ের শেষ নেই। কেননা এটিকে আল্লাহ পাক গোপন করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি ঐ রাতকে পাবে সে যেন ইবাদত করে ফজর করে দেন।

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত (রঃ) এর বিবৃতি অনুযায়ী শবে কদর সমগ্র বর্ষ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। সারা বছর পরিক্রমণ করে থাকে এ রাত। হযরত শেখ আকবর মহিউদ্দীন ইবনে আরবী তদীয় ফুতুহাতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, আমি এই রাতকে শা'বান এবং রবিউল আউয়াল চান্দ্র মাসেই দেখেছি, আর অধিকাংশ রমজান মাসেই পেয়েছি।

তবে অধিকাংশ আলেমদের মতানুসারে শবে কদর রমজান মাসের শেষ দশ দিবসের বেজোড় রাত্রিতে। ইমাম শাফেয়ীর মতানুসারে একুশ ও তেইশ তারিখে, হানাফী মজাহাবীদের মতে সাতাশ তারিখে ঐ মর্যাদাবান রাতকে পাওয়া যায়। এদের যুক্তি সংগত প্রমাণ্য দলিল হলো রইসুল মুফাসসেরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন সেটা। আর তা হলো, লাইলাতুল কদর আরবী বাক্যে ৯টি বর্ণ রয়েছে, আর ঐ বাক্যটি কুরআন মজিদে ৩ বার বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ৩x৯ = ২৭, এটা ইঙ্গিত সূচক বাণী যে যদিও গোপন করে রাখা হয়েছে তবুও ২৭ রমজানের নির্ধারণ পরোক্ষভাবে আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন। আমরা হানাফী মজহাব এর আলেমগণ তাই ২৭ তারিখে শবে কদর পালন করে থাকি।

শবে কদর গোপন রাখার রহস্যঃ আল্লাহ পাক কতেক বস্তুকে কতেকের মধ্যে গোপন করে রেখেছেন। যেমন, ক. দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চিত সময়টুকু জুমার দিনে, খ. পঞ্চ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে সালাতে ওয়াস্তা বা মধ্যবর্তী নামাজকে, গ. ইসমে আ'যমকে আল্লাহর গুণবাচক নাম ও কুরআনে করীমের মধ্যে, ঘ. মকবুল ইবাদতকে অপরাপর ইবাদতের মধ্যে, চ. আওলিয়া এ কিরামকে অন্যন্য লোকদের মধ্যে, ছ. লাইলাতুল কদরকে রমজান শরীফের মধ্যে। এ কারণে গোপন করে রাখা হয়েছে যাতে সেটার খোঁজখুঁজি ও তালাশের মধ্যে মুমিনের আসক্তি থাকে। নির্ধারিত দিবস হলে তাতে কেউ কেউ সম্মান দিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হতো আবার কেউ কেউ অবহেলা করে পাপে লিপ্ত হতো। এখন গোপন রাখাতে মনে একটা ভীতি ও আশার সঞ্চার হবে। কোন পাপ কর্ম করে এরকম শ্রেষ্ঠ রজনীকে কেউ অবহেলায় হারাবে না তার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক সেটাকে গোপন করে রেখেছেন। যেমনিভাবে মৃত্যুর দিন ক্ষণ ও কিয়ামত দিবসের সঠিক তারিখটিও গোপন রেখেছেন মানুষের নিকট। যাতে করে মানুষ সদা সর্বদা কষ্ট স্বীকার করে ইবাদত বন্দেগী ও আল্লাহ রাসুলের ফরমাবরদারী করতে থাকে। ন্যূনতম কষ্ট ও চেষ্টা চালাতে যেন কোন রূপ অবহেলা না করে, কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে, কোন রূপ গাফলতী কে যেন প্রশ্রয় না দেয়। বস্তুত গোপন বস্তুকে উদঘাটন ও নিখোঁজকে খোঁজ করাটাই মানবের একটা অন্যতম চাহিদা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এ মহান রজনীকে রহস্যাবৃত করে রাখাটা আল্লাহ তা'আলার একটি মহা কৌশল; এতে নিহিত রয়েছে মানব কল্যাণ।

কদরের রাতে আত্মা সমূহের অবতরণঃ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম কুরআন মজিদের ভাষ্য অনুযায়ী এ রাতে পবিত্র ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রূহ বা আত্মা অবতীর্ণ হওয়ার কথাও বিবৃত হয়েছে।

এখানে রূহ বা আত্মার অনেক ধরণের বিশ্লেষণ রয়েছে, ১. রূহ হলো এক বিশালকায় ফিরিস্তা, ২. রূহ নামক বিশেষ কিছু ফিরিস্তা, ৩. হযরত আদম (আঃ) এর রূহ হযরত ঈসা (আঃ) এর রূহ, ৫. স্বয়ং ঈসা (আঃ), ৬. আমাদের প্রিয় নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র রূহ মোবারক, ৭. স্বয়ং জিব্রাঈল (আঃ)।

এ সব আত্মা অবতীর্ণ হয়ে এ রজনীকে আরো মহিমামণ্ডিত করে তোলেন। আর আত্মা সমূহ অবতীর্ণ হন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে তাই কোন কোন আত্মাকে তিনি পৃথিবীতে তার বান্দার কাছে পাঠাবেন তিনিই ভালো জানেন।

একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণঃ এ মহামহিম রজনীতে ইবাদত কারীদের কদর ও মরতবা (সম্মান ও মর্যদা) প্রকাশ পেয়ে থাকে। অন্যান্য রাতের সাথে এ রাতের ভিন্নতা রয়েছে এখানেই আল্লাহর বান্দাদের বেলায়ত বা খোদার নৈকট্য প্রাপ্তি ক্রমে বন্ধুত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে এ রজনীতে আলমে মালাকুত ও আলমে আরওয়াহ বা ফিরিস্তা জগত ও আত্মিক জগতের উপর প্রকাশ থাকে। সে সময় কুতবিয়ত, গাউসিয়ত, আবদালিয়াত এবং ইমামিয়ত এর পদ মর্যাদার অধিকারী মহা মানবদের জন্য উক্ত রাত্রিকে ঐ সব মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা হয়। আর এসব কর্মকাণ্ডকে রাত্রের সাথে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ একারণেই করা হয়েছে যে, দিবা ভাগ প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্র যা আলমে শাহাদত বা প্রত্যক্ষ দর্শনের জগতের সাথে সম্পৃক্ত। এবং রাত্রিভাগ হলো পরদাপুশী বা আবৃত করার সময় যা আলমে গাইব বা অদৃশ্য জগতের সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সামঞ্জস্য রাখে। এ রাত্রির ভেদ্ বা রাজ-রহস্য ওটা যা আরেফ বা খোদ পরিচিতি জ্ঞান অর্জনকারীদের নিকট পরিজ্ঞাত

হয়েছে।

রাত হলো মিলন কালের মোক্ষম সময়। উক্ত রাত্রিতে মিলনের যে পদ্ধতি রয়েছে তার বাস্তবায়ন কল্পে মিলনকারী মহান আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে ঝলওয়া ফরমান বা সরাসরি নূর বিকিরণ করে থাকেন যাতে জমালে ইলাহী বা খোদায়ী সৌন্দর্যচ্ছটা সহকারে আপন অধীর আগ্রহান্বিত বান্দাদের অবস্থার দিকে কুদরতী চেহারা নিবিষ্ট হয়ে যায়। সে সময় তাদের মেধা মননে একটি বিশালতার সৃষ্টি হয়। তখন ধারণাগত শক্তি প্রাপ্তিগত শক্তির সেবা করতে থাকে। এমতাবস্থায় ঐ তজল্লী বা জ্যোতিচ্ছটা একটি জগতকে ফিরিস্তাবৃন্দ এবং আত্মাবৃন্দ যেগুলো আলমে কুদস বা মহা পবিত্র ও সম্মানিত জগতে অবস্থানরত আছে তাদের সাথে সঙ্গী করে নেয়। আর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাটা দৃশ্য জগতকে অদৃশ্য জগতের সাথে মিলন ঘটানো আর উর্ধাকাশের কামালিয়াত পূর্ণ সত্তাদেরকে ভূ-মণ্ডলের কামালিয়াত পূর্ণ সত্তাদের সাথে সম্মিলিত করা হয় কতিপয় নূর ও জ্যোতি একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়ে থাকে। এতে এ ধরণের কল্যাণ সাধিত হয় যে, এক জগত অপর জগত থেকে দেদীপ্যতা প্রাপ্ত হয়ে দীপ্তিমান হয়ে উঠে। এভাবে কামালাতের আলো মণ্ডলী হতে এই রাত অতীব উত্তম রূপে আলোময় হয়ে যায় আর রূহানী জগতে একটি আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দেয়া বড়ই কঠিন, বড়ই দুষ্কর। তবুও একটি অপূর্ণ উদাহরণ দ্বারা তা বুঝানোর প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। তা হলো: এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, যেমন বসন্তকাল আগমণের প্রাক্কালে এমন একটি মওসুম এর উদভব ঘটে যার ফলশ্রুতিতে বসন্তকাল পরিলক্ষিত হয়। বসন্তকাল দেখলেই অনুভব করতে হবে যে, ইতি পূর্বে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের ফলে এবং সূর্যের উত্তাপের তেজস্বীতার দরুণ ভূমিতে যে উদগমনের শক্তিতে প্রভাত বিস্তার করে, আর প্রতিটি বীজে ও শস্যের মধ্যে যে যে ধরণের অবয়ব বা আকৃতি লুকায়িত থাকে তা সবই বিভিন্ন ধরণের চারা গাছ, ফুল-ফল রূপে, সজীবতা প্রকাশ পেয়ে এ ধরণীকে সুশোভিত করে তোলে। রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গীন করে তোলে পৃথিবীকে। এতে করে পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয় এ পৃথিবী।

অনুরূপ আল্লাহর তজল্লী রূপচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় আল্লাহর বান্দাদের উপর শবে কদর রাতে এবং তা সারা বছর ধরে বান্দার উপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

কদর রাত্রির কিছু করণীয়: রমজান শরীফের ২৭ তম রাত্রি শবে কদর। এ রজনী আরম্ভ হওয়ার প্রাককালে মাগরীবের পূর্বে সূর্যাস্তের সময় ৪০ বার لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম" এ দোয়াটি পাঠ করলে ৪০ বছরের সগীরা গুনাহ বা ক্ষুদ্র পাপ সমূহ মাফ হয়ে যায়। পুনশ্চঃ ঐ রাতের সূচনায় ইবদতের নিয়ত ও উদ্দেশ্যে গাত্র প্রাক্ষালন কিংবা গোসল করে ফেললে শরীর থেকে যত ফোটা জল ঝরবে ততটি গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেবেন। ঐ রাত্রে যে দোয়াটি বেশী বেশী করে পাঠ করার কথা হাদীস শরীফে এসেছে তা হলো

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা য়াফুউন তুহিব্বুল য়াফওয়া ফায়্ফু য়ান্নী-ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুর"

এ রজনীতে কমপক্ষে ১২ রাকাত নফল নামাজ একাকী কিংবা জামাত সহকারে পড়া খুবই উত্তম। দু'রাকাত করে নিয়ত করতে হয়। নিয়ত হলো "না ওয়াই তু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকায়াতাই সালাতিল লাইলাতুল কদর, নফল মুতাওয়াজজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবর" প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ১ম রাকাতে সূরা ইন্না আনজালনা বা সূরা কদর একবার এবং ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করা উত্তম।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এর মধ্যে সূরা ইয়াছিন শরীফ তিনবার এবং সূরা দোখান শরীফ সাত বার পাঠ করা উত্তম। এতদভিন্ন বহুবিধ নফল নামাজ পাঠ করা, যেমন সালাতুত তছবিহ, সালাতুত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি। মীলাদ-কিয়াম, দরুদ-সালাম, দোয়া-মুনাজাত, জিকির-আজকার, মুরব্বী ও আওলিয়া-এ-কেরামের রওজা শরীফ জিয়ারত এ রাতের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হওয়া আবশ্যক।

উপসংহার: হাদীস শরীফে আছে,

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি শবে কদরকে ঈমান সহকারে নামাজ এবং ইবাদতের মাধ্যমে এবং সওয়াব বা পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে জীবিত রাখবে তাহলে তার পূর্ব জীবনের সমস্ত গুনাহ বা পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।' ফিরিস্তা ও আত্মা সমূহ ঐ রাতে ভোর হওয়া পর্যন্ত সকল মুসলমানের উপর সালাম বলে থাকেন আর কামেল ব্যক্তিদের সাথে মোসাফা বা করমর্দন করে থাকেন। এতে সাক্ষাৎ লাভের অভিব্যক্তিটি ফুটে উঠেছে। ইয়া আল্লাহ আপনার রাসুল (দঃ) ও গাউসুল আ'যমের উসিলায় এ মহান রজনীতে আমাদের ফরিয়াদ কবুল করুন। আমীন।

শাহেনশাহে বেলায়ত মওলা আলী কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু

● আবুল ফজল মোহাম্মদ ছাইফুল্লাহ সুলতানপুরী ●

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে গগনের নক্ষত্রের সাথে তুলনা করে বলেন যে, আমার সাহাবাগণ এক একজন নক্ষত্র তুল্য। তুমি যাকে অনুসরণ করবে না কেন হেদায়তের আলোকবর্তিকা লাভে সমর্থ হবে। কারণ তাঁরাই মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান, যারা ছরকারে দোজাঁহা রউফুর রহিম শফিউল মুজনাবিন, খাতেমুন নবীয়ীন আহমদ মুজতবা (দঃ) কে নয়ন জুড়ে অবলোকন করে দৃষ্টির পিপাসা নিবারণে সক্ষম হয়েছেন ও হৃদয়ের তৃষ্ণাকে তাঁর ঈমানের জলে সিক্ত করেছেন। তাই তারা সাহাবীয়ত এর মর্যাদা পেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌভগ্যবানদের দলভুক্ত হন। প্রিয় নবী (দঃ) এর অমিয় বাণী "خيارهم فى الجاهليه خيارهم فى الاسلام" "যারা জাহিলিয়াতের যুগে মর্যাদাবান ছিলেন তাঁরা আবার ইসলামী যুগেও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন" এ তথ্যের ভিত্তিতে সাহাবাদের কিছু সংখ্যক জ্ঞানেগুণে, ইলমে, হিকমতে, প্রজ্ঞায়, বুদ্ধিতে অগ্রগামী। তাঁরাই উলিল আ'যম সাহাবা হিসেবে পরিচিত। এবং প্রত্যেক সাহাবাগণ এক একজন এক এক বৈশিষ্ট্যে বা গুণে গুণান্বিত। তাঁদের মধ্যে শাহেন শাহে বেলায়ত মুস্তফা কি জান, মানারুল ঈমান, মারিফত কা আসমান, শময়ে ইরফান, রূহে ইসলাম, মুশকিল কোশা হাজত রাওয়া সৈয়দুনা হযরত হায়দরে কাররার আলী বিন আবি তালিব কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু অন্যতম বিশেষ ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। দৃশ্যত কয়েকটি কারণ তাঁর মধ্যে দৃষ্টি গোচর হয়, যা অন্যান্য কোন সাহাবীর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। যেমন তিনি রসুল (দঃ) এর বনু হাশেম গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি অতি শৈশবে রসুল (দঃ) এর পরিবারভুক্ত হন। তৃতীয়তঃ শৈশব হতেই তিনি নবী (দঃ) জীবনাদর্শে গড়ে উঠেন এবং তিনি দেহের ছায়ার ন্যায় প্রিয় নবী (দঃ) এর সাহচর্য গ্রহণ করেন, ইত্যাদি ছাড়াও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মওলা আলী প্রিয় নবী (দঃ) এর রূহানিয়াতের সিংহভাগের অধিক স্থান দখল করে নিয়েছেন। তাই নবী (দঃ) সেদিকে ইংগিত পূর্বক ইরশাদ করেন, انا مدينة العلم وعلى بابها 'আমি ইলমে মারিফতের শহর আর আলী হল ঐ শহরের দ্বার' অনুরূপ হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ইরশাদ করেন,

قسمت الحكم عشرة اجزاء فاعطى على تسعة اجزاو الناس جزاً واحداً

'জ্ঞান বা ইলমকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তা হতে হযরত আলী (রাঃ) কে নয় ভাগ দেয়া হয়েছে, এবং বাকী এক ভাগ সমগ্র পৃথিবীবাসীকে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। কাজেই মওলা আলী (রাঃ) এর এ বিশাল মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য কোন স্বার্থন্বেষী মহলের স্বার্থ হাছিলে খাট করে দেখার সুযোগ নেই। আর তাঁকে খাট করে দেখা সূর্য্যকে প্রদীপ দেখানো বৈকি।

নামও বংশ পরিচয়ঃ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রঃ) হযরত আলী বিন তালিব (রাঃ) এর বংশ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

علي بن ابى طالب رضى الله عنه واسم أبى طالب عبدالمناف بن عبد المطلب' واسمه شيبة بن هاشم' واسمه عمرو بن عبدمناف' واسمه المغيرة بن قصى' واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ابن فهربن مالك بن نضربن كنانة۔ أبوالحسن' وابوتراب كناه بها النبى صلى الله عليه وسلم۔

আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) আবু তালেবের নাম আব্দুল মোনাফ বিন আব্দুল মোত্তালিব, তাঁর নাম শাইবা বিন হাশিম তাঁর নাম আমর বিন আব্দুল মোনাফ তাঁর নাম মুগীরা বিন কাসী তাঁর নাম জায়েদ বিন কিলাব বিন মাররাহ বিন কা'ব বিন লুয়ী বিন গালিব ইবনে ফখর বিন মালিক বিন নজর বিন কিনানাহ, আবুল হাসান আবু তোরাব কুনিয়াত নবী (দঃ) তাঁকে দিয়েছিলেন। (তারিখুল খোলাফা- ১৫৫ পৃঃ)

হযরত আলী (রাঃ) এর স্বনামধন্য পিতা আবু তালিবের প্রকৃত নাম আবদে মোনাফ। আবু তালিব তার কুনিয়ত। ইতিহাসে তিনি এ ডাকনামেই বিখ্যাত হয়ে পড়েন। আবু তালিবের চার পুত্র ও দু কন্যা ছিল। জোষ্ঠ পুত্র তালিব, তিনি চাপের মুখে কাফেরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধের পূর্বে বদরের রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। এবং কিছু দিন পর তিনি মারা যান। তালেবের ছোট আকীল, তাঁর ছোট জা'ফর তাইয়্যার এবং সর্ব কনিষ্ঠ হযরত আলী (রাঃ)। আবু তালিবের প্রথম পুত্র ব্যতীত বাকী তিন জনই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু তালেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা উম্মে হানী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ কন্যা হামানাহ এর ইসলাম গ্রহণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) এর মহিয়সী মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশেম। এ প্রসংগে আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) বলেন, أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم هى أول هاشمية ولدت هاشميا' قد أسلمت وهاجرت۔ 'তাঁর মাতা হলেন

ফাতেমা বিনতে আসদ বিন হাশিম, তিনি হাশেমী বংশীয়। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনা হিজরত করেন। মোট কথা হযরত আলী (রাঃ) এর পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে হাশেমী বংশীয় ছিলেন।

জন্ম ও শৈশব: হযরত আলী (রাঃ) এর জন্ম সময় নিয়ে একমত যে, তিনি পারস্য রাজা নওশেরওয়াঁ এর রাজত্বকালে আবরাহা বাদশা কর্তৃক খানায়ে কাবা আক্রান্ত হওয়ার বত্রিশ বছর পর ১৫ কিংবা ২৩ রজব মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম স্থান নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ দেখা দিলেও প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল। জাহেলী যুগে রজব মাসের ১৫ তারিখে কাবা শরীফের দ্বার উন্মুক্ত করা হত। এবং একদিন পুরুষ ও একদিন স্ত্রী লোকদের জন্য খোলা হত। আর লোকেরা কাবা ঘরে প্রবেশের দুর্লভ সম্মান লাভ করত। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের কারণে তারা এ দিনটিকে ইয়ামুল এস্তেফতাহ নামকরণ করে ঐ দিন খানায়ে কাবার দরজাকে সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখতেন। স্ত্রী লোকদের যিয়ারতের দিন ফাতেমা বিনতে আসাদ কাবা শরীফের দরজা পানে উপস্থিত হন। হযরত আলী (রাঃ) ঐ সময় মাতার গর্ভে ছিলেন। এবং প্রসবকাল ছিল অতি সন্নিকটে। বছরে একদিন মাত্র কাবা শরীফের দরজা খোলা হয় তাই এ সুযোগকে না হারাতে হযরত আলী (রাঃ) এর আম্মা কাবার দরজায় প্রচন্ড ভিড় উপেক্ষা করে কাবার দরজা পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হন। কিন্তু উঠবার সিঁড়ি না দেখে তিনি থমকে দাঁড়ান। কারণ কাবা গৃহের দরজা একজন মানুষের মাথা সমান উচু ছিল। দুজন পুরুষ তাকে টেনে কাবার অভ্যন্তরে পৌছিয়ে দিলেন। এ টানা টানির ফলে তাঁর প্রসব বেদনা আরম্ভ হল এবং শেষে তাঁর বেদনা তীব্র হলে কাবার অভ্যন্তরে এক পার্শ্বে তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনিই হলেন সে মহান সত্তা মুশকিল কোশা শাহেন শাহে বেলায়ত মওলা আলী (রাঃ)।

মওলা আলী (রাঃ) এর ডাক নাম: ইমাম আলী মকাম হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর নামানুসারে হযরত আলী (রাঃ) এর ডাকনাম হল আবুল হাসান। কিন্তু হুযুর (দঃ) তাঁর নাম দিয়েছেন আবু তোরাব। এ প্রসংগে বোখারী শরীফে "কিতাবুল আদাব" শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে,

عن سهل بن سعد قال ان كان احب اسماء على رضى الله عنه اليه اباتراب وان كان ليفرح ان يدعى به' وماسماه اباتراب الاالنبى عليه الصلواة والسلام' وذالك أنه غاضب يوما فاطمة' فخرج فاضطجع إلى الجدار فى المسجد' فجاء النبى عليه الصلواة السلام' قد امتلا ظهره ترابا' فجعل النبى ﷺ يمسح التراب عن ظهره ويقول "اجلس أبا تراب"

হযরত সাহল বিন সায়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তোরাব নামটি হযরত আলী (রাঃ) এর খুব পছন্দীয় ছিল। কেউ তাঁকে এ নামে সম্বোধন করলে তিনি আনন্দিত হতেন। কিন্তু নবী (দঃ) ব্যতীত কেউ তাঁকে এ নামে সম্বোধন করেন নি। একদা তিনি নবী তনয়া ফাতেমা (রাঃ) এর সাথে কোন বিষয়ে অভিমান করেন। এবং মসজিদের দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। এমতাবস্থায় প্রিয় নবী (দঃ) এসে দেখলেন যে, তাঁর পিঠ মাটিতে ধুসরিত হয়েছে। প্রিয় নবী (দঃ) তাকে মৃত্তিকা লিপ্ত দেখে নিজ হাতে তা পরিষ্কার করে বললেন বসে পড় হে আবু তোরাব বা মাটির পিতা, মৃত্তিকা মিশ্রিত। ঐ দিন হতে তাকে ঐ নামে সম্বোধন করা হত। আলী তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নাম। পিতা মাতাই তাঁর এ নাম রেখেছিলেন। তাঁর মা প্রদত্ত আরেকটি নাম ছিল তা হল "হায়দার" বা সিংহ।

হযরত আলী (রাঃ) এর আকার আকৃতি:

كان على شيخا' سمينا' أصلع' كثير الشعر' ربعه الى القصر' عظيم البطن' عظيم اللحية جدا' قد ملأت مابين منكبيه بيضا كانها قطن ادم شديد الادمة۔

হযরত আলী (রাঃ) ভাবগাম্ভীর্য্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বাস্থ্যবান, উন্মুক্ত ললাটের অধিকারী, ঘন কালো কেশরাজির অধিকারী, নাতিদীর্ঘ নাতি খর্ব দেহাকৃতির অধিকারী, পেট ছিল কিছুটা ভারী, ঘন দাড়ী বিশিষ্ট, মাংসল স্কন্ধ বিশিষ্ট এবং পৌরুষত্বের অধিকারী। তাঁর শক্তি সম্পর্কে হযরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

فقال جابر بن عبدالله حمل على الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها' واتهم جرّوه بعد ذالك فلم يحمله الا اربعون رجلاً (اخرجه ابن عساكر)

ইবনুল আসাকীর হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, খাইবরের দিন হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পিঠে করে এক বিশালাকৃতির লৌহ দরজা বহন করেছিলেন ফলে মুসলমানগণ খাইবর বিজয় করতে সক্ষম হন। তিনি উক্ত লোহার দরজাকে দূরে নিক্ষেপ করেন পরবর্তীতে চল্লিশজন শক্তিশালী লোক ঐ দরজা বহন করেছিলেন।

ইবনে ইসহাক তার "মাগাজী" গ্রন্থে ও ইবনে আসাকির আবি রাফে থেকে বর্ণনা করেন,

فلقد رأينا لمائة نفر نجتهد أن نقلب ذالك الباب فلما استطعنا ان نقلبه

খায়বরের ঐ কপাট খানিকে আমরা আশিজন লোক চেষ্টা করেও বিন্দু মাত্র নড়াচড়া করতে পারিনি।

রসুল (দঃ) কর্তৃক দেয়া উপাধি গুচ্ছ: হুযুর (দঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে খাইবরের যুদ্ধে পতাকা হাতে দিয়ে বলেন,

انت اسد الله من اسد الله তুমি শেরে খোদা আসাদুল্লাহ। উল্লেখ্য হযরত আলী (রাঃ) এর কয়েকটি উপাধি স্বয়ং রসুল (দঃ) প্রদত্ত যথা (১) আসাদুল্লাহ বা শেরে খোদা, (২) কাশিফুল কুরবাত বা মুশকিলকোশা, (৩) মওলা আলী, (৪) আবু তোরাব, (আল বেদায়া)

মওলা আলী (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। আল্লামা ইবনে হাজর হাইতমী মক্কী (রঃ) 'আস সাওয়ায়েকুল মুহরেকাহ' গ্রন্থে ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রঃ) তারিখুল খোলাফা গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

اسلم وهو ابن عشر سنين وقيل تسع وقيل ثمان وقيل دون ذالك قديما بل قال ابن عباس وانس وزيدبن ارقم وسلمان الفارسى وجماعة انه اول من اسلم ونقل بعضهم الاجماع عليه

তিনি দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন, কেউ বলেন নয় বছর আর কেউ বলেন আট বছর। ইবনে আব্বাস, আনাস, যায়েদ বিন আরকম, সালমান ফারসী সহ এক দল সাহাবী বলেন যে, তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। এবং কেউ বলেন এর উপর সকলের ঐক্যমত রয়েছে। (তারিখুল খোলাফা ১৫৬ পৃঃ, আস্‌সাওয়ায়েকুল মুহরেকাহ ১২০ পৃঃ।)

মওলা আলী (রাঃ) কখনো মূর্তি পূজা করেননি: আইয়্যামে জাহেলীয়ার যুগে হযরত আলী (রাঃ) কখনো মূর্তি পূজায় লিপ্ত হননি। শিরিক কুফরের কোন কালিমা তাঁর পবিত্র সত্তায় লেপনের কোন সুযোগ ছিলনা যেমন,

اخرج ابن سعد عن الحسن بن زيد قال لم يعبد الاوثان قط لصغره

ইবনে সায়াদ হযরত হাসান বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন হযরত আলী কখনো বাল্যকালে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হননি।

মওলা আলী (রাঃ) আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত:

عن سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الاية فقيل تعالوا ندع ابناء نا وابنائكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هولاء اهل بيتى۔

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, যখন আয়াতে মোবাহেলা অবতীর্ণ হয়, তখন নবী (দঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন কে সম্বোধন করলেন, হে আল্লাহ এরাই হচ্ছেন আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সাবী (রাঃ) হযরত জাবের (রাঃ) এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতে মোবাহেলায় انفسنا দ্বারা নবী (দঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) উদ্দেশ্য।

قال جابر انفسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وابنائنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمة رضى الله عنها۔

انفسنا দ্বারা নবী (দঃ) ও আলী (রাঃ) উদ্দেশ্য। ابنائنا দ্বারা হযরত হাসান এবং হুসাইন উদ্দেশ্য এবং نسائنا দ্বারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) উদ্দেশ্য। (মুসলিম, তিরমিজি (২খণ্ড), রিয়াজুন নজর ২য় খণ্ড ২৪৮ পৃঃ, সাওয়ায়েকুল মুহরেকাহ ১০৭ পৃঃ, মুসতাদরেক ২য় খণ্ড, ৫৯৪ পৃঃ, নসিমুর রিয়াজ, ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ, দলায়েলুন নবুয়াত ১ খণ্ড ২৯৮ পৃঃ, দুররে মনছুর ২ খণ্ড ৩৮ পৃঃ, মুয়ালেমুত তানজীল ও খাজেন ১ম খণ্ড ১২৩ পৃঃ, তারিখুল খোলাফা ১১৫ পৃঃ)।

পুরুষদের মধ্যে নবী (দঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বেশী ভালবাসতেন: তিরমিজি শরীফের ২য় খণ্ডে, ২১ পৃঃ বর্ণিত আছে যে,

عن عبدالله عن بيه قال كان احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاطمة ومن الرجال على

হযরত আবদুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (দঃ) মহিলাদের মধ্যে হযরত ফাতেমাকে ও পুরুষদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) কে বেশী ভালবাসতেন।

عن عائشة رضى الله عنها كانت فاطمة أحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها على احب الرجال اليه۔

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত ফাতেমা হলেন রসুল (দঃ) এর নিকট অধিক পছন্দনীয়দের একজন এবং তাঁর স্বামীও পুরুষদের মধ্যে অধিক পছন্দনীয় একজন। (তিরমিজি শরীফ)।

খায়বর বিজয়ের পতাকা ছিল মওলা আলী (রাঃ) এর হাতে ও চক্ষু রোগ থেকে মুক্তি লাভ: ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সাহাল বিন সাদ থেকে, ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেন ইবনে উমর, ইবনে আবি লায়লা ও ইমরান বিন হুসাইন থেকে আল বাজজার বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস থেকে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فباته الناس يذكرون اى يخوضون ويتحدثون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوان يعطاها فقال أين على بن ابى طالب فقيل يشكى عينيه قال فارسلوا اليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينيه ودعاله فبرى حتى كان كان لم يكن به وجع فأعطاء الراية۔

খাইবরের দিন নবী (দঃ) বললেন আগামীকাল আল্লাহ এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে খাইবর বিজয় করবেন যাকে আল্লাহ ও তার রসুল (দঃ) ভালবাসেন ও আল্লাহ ও রসুল (দঃ)কে তিনিও ভালবাসেন, ঘোষণা শুনে এ বিরল সম্মানের প্রত্যাশি সাহাবাগণ শয়ন করলেন এবং এ কথা বলাবলি করতে লাগলেন যে, আগামীকাল না জানি কাকে পতাকা

প্রদান করা হয়। প্রভাতে সকলে এ ভাবনায় ছিল হয়তো আমিই সে ভাগ্যবান পুরুষ যাকে পতাকা দেয়া হবে।

অতঃপর যখন সকাল হল প্রত্যেকে এ সম্মান পাওয়ার আশা পোষণ করেন। প্রিয় নবী (দঃ) বললেন আলী কোথায়? সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছে। নবী (দঃ) বললেন তাকে আমার নিকট প্রেরণ কর। অতঃপর নবী (দঃ) থুথু মোবারক নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর চক্ষে মালিশ করে দিলেন। ফলে তার চক্ষু ভাল হয়ে গেল। এবং খায়বরের পতাকা তাঁর হাতে প্রদান করা হল এবং তিনি তা বিজয় করেন। এরপর তাঁর চোখে আর কখনো এ রোগ দেখা দেয়নি।

মওলা আলী (রাঃ) কে নবী (দঃ) এর দায়িত্ব অর্পনঃ

اخرج الشيخان عن سعد بن ابى وقاص وأحمد والبزار عن سعيد الخدرى والطبرانى عن اسماء بنت عميس وام سلمة وحبشى بن جنادة وابن عباس وجابر بن سمرة وعلى والبراء بن عازب وزيدبن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف على بن ابى طالب فى غزوة تبوك فقال يارسول الله تخلفنى فى النساء والصبيان؟ فقال اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى غيران لا نبى بعدى۔

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রঃ) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে আল বাজজার আবু সাইদ খুদরী হতে, তিবরানী আসমা বিনতে আমিশ, উম্মে সালমা, হাবশী বিন জুনাদাহ ইবনে আব্বাস, জাবের বিন সুমরাহ, আলী, বাররাহ বিন আযেব, যায়েদ বিন আরকম হতে বর্ণনা করেন, রসুল (দঃ) তাবুকের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) কে মহিলা ও শিশুদের দেখা শুনার জন্য তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। তখন হযরত আলী (রাঃ) আরজ করলেন হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আপনি আমাকে মহিলা ও শিশুদের দেখভাল করার জন্য আপনার প্রতিনিধি করেছেন? তখন নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও? মুসা (আঃ) তুর পর্বতে যাওয়ার সময় যেমন নিজ ভাই হারুন (আঃ) কে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন তেমনি আমি তোমাকে হারুন (আঃ) এর ন্যায় খলিফা নির্বাচিত করলাম অধিকন্তু পার্থক্য এতটুকু আমার পর আর কোন নবী নেই।

মওলা আলী (রাঃ) হলেন বেলায়তে মুহাম্মদী (দঃ) এর মূল প্রবেশদ্বারঃ শাহেনশাহে বেলায়ত মুশকিল কোশা মওলা আলী (রাঃ) হলেন বাতেনী বেলায়তে মুহাম্মদী (দঃ) এর মূল প্রবেশ দ্বার, যা সকল সূফিয়ানে কিরামের অভিমত। এ দৃষ্টি ভংগির সমর্থনে মওলা আলীর (রঃ) শানে প্রিয় নবী (দঃ) এর অনেক উক্তি ও সমর্থন বিদ্যমান। তাই এখানে খিলাফতের প্রচলিত বিধানকে অস্বীকার বা অনুরূপ বেলায়তের সুক্ষ্ম তত্ত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন মহলের সুযোগ নেই। তাই মওলা আলী (রাঃ) এর এ বিষয়টি সকলকে অকপটে স্বীকার করতে হবে। যেমন কয়টি বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, গদীরে খোমের দিন প্রিয় নবী (দঃ) মওলা আলীকে মওলা ঘোষণা করেন। যার প্রকৃত মর্মার্থ হল মওলা আলী ই হলেন প্রিয় নবী (দঃ) ও পৃথিবীর সকল মুমীন মুমীনাহদের পরম প্রিয়, শ্রদ্ধার পাত্র, প্রেমাস্পদ, সর্বোপরি তিনি হবেন সকল রুহানী ছিলছিলা বা ত্বরীকার মূলবিন্দু। নিম্মের বর্ণনাগুলো এ মতকেই সমর্থন করে,

قال صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه۔ رواه النسائى

নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, আমি যার মনিব বা মওলা বা প্রেমাস্পদ হযরত আলী (রাঃ)ও তাঁর মওলা। হে আল্লাহ যে ব্যক্তি হযরত আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব রেখো। আর যে তাঁর সাথে শত্রুতা রাখবে তুমিও তাঁর শত্রুতার জবাব দাও।

عن حبشى بن جناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى وانا من على' لايؤدى منى الا أنا اوعلى۔ رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجه

হযরত হাবশি বিন জুনাদাহ হতে বর্ণিত নবী (দঃ) ইরশাদ করেন আলী আমা হতে আমি আলী হতে। (আহমদ, তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

عن ابى عمر وعلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انامدينة العلم وعلى بابها وفى رواية فمن اراد العلم فليات الباب وفى اخرى عند الترمذى عن على انا دار الحكمة وعلى بابها۔

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, আমি ইলমের শহর ও আলী ঐ শহরের দরজা। অন্য বর্ণনায় আছে যে ঐ ইলমের অংশীদার হতে চায় সে যেন ঐ দরজার নিকট আগমন করে। তিরমিজি শরীফের অপর বর্ণনায় আছে হযরত আলী (রাঃ) ইরশাদ করেন, নবী (দঃ) বলেছেন, আমি হিকমতের ঘর আর আলী ঐ ঘরের দরজা। (আল বাজজার, তাবরানী, হাকেম, ও তিরমজি)

اخر الطبرانى فى الاوسط بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس من شجرة شتى وانا وعلى من شجرة واحدة

قال النبى صلى الله عليه وسلم انا وعلى من نور واحد۔

ইমাম তাবরানী আওছাত গ্রন্থে জয়িফ সনদে বর্ণনা করেছেন হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে তিনি বলেন, নবী (দঃ) ইরশাদ করেন মানুষ ভিন্ন প্রকার বৃক্ষের ফলের

ন্যায় হয়। আর আমি ও আলী একই বৃক্ষের ফলের ন্যায়। নবী (দঃ) ইরশাদ করেন আমি আর আলী (রাঃ) একই নুর হতে সৃষ্টি।

عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال النظر الى على عبادة۔ اسناده حسن

হযরত আবি মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (দঃ) ইরশাদ করেন আলীর (রাঃ) এর প্রতি দৃষ্টি দান ইবাদতের শামিল। (তাবরানী, হাকিম তা বর্ণনা করেন।)

أخرج ابويعلى والبزار عن سعدبن ابى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذى عليا فقد اذانى۔

আবুল ইয়ালা এবং বাজজার হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণনা করেন রসুল (দঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়।

عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماتدرون من على ماتدرون من على ان علياً منى وانا منه وهو ولى كل مؤمن بعدى كما اخرجه الترمذى والحاكم فى المستدرك۔

হযরত ইমরান বিন খুসাইন হতে বর্ণিত নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা কি জান আলী কে? তোমরা কি জান আলী কে? তোমরা কি জান আলী কে? নিশ্চয় আলী আমা হতে আর আমি আলী হতে। তিনি প্রত্যেক মুমীনের প্রেমাস্পদ আমার পরবর্তীতে। (তিরমিজি, মুসতাদরিক)।

হযরত আলী রেসালতে মুহাম্মদী (দঃ) পরিপূর্ণকারীঃ

عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال على يقضى دينى

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত নবী (দঃ) ইরশাদ করেন হযরত আলী (রাঃ) আমার ধর্মের পরিপূর্ণ কারী। (আল বাজজার)

عن البراء و ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال على منى بمنزلة رأس من بدنى۔

হযরত বাররাহ ও ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, হযরত আলী (রাঃ) আমার দেহে মাথার ন্যায়।

হাদিসটি খতীব বাগদাদী বাররাহ হতে ও দাইলমী ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন।

قال النبى صلى الله عليه وسلم على منى وانا من على لحمه لحمى ودمه من دمى۔

নবী (দঃ) ইরশাদ করেন আলী আমা হতে আমি আলী হতে তাঁর মাংস আমার মাংস তাঁর রক্ত যেন আমার রক্ত। (মুসনদে আহমদ, তিরমিজি, রিয়াজুন নজর)

মওলা আলী (রাঃ) কুরআন ও সত্যের ধারক বাহকঃ ইমাম তাবরানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على مع القران والقران مع على لايفترقان حتى يرد علىّ الحوض وقال النبى صلى الله عليه وسلم على مع الحق والحق مع العلى۔

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (দঃ) হতে শুনেছি, হযরত আলী কুরআনের সাথে। আর কোরআনও আলীর সাথে। তারা এক অপর হতে পৃথক হয়না কিয়ামত দিবসে তারা উভয়ে কাউছারের নিকট আমার সাথে মিলিত হবে। নবী (দঃ) আরো বলেন, সত্য আলীর সাথে আলী সত্যের সাথে। (আওসাত, তিরমিজি)

মওলা আলী (রাঃ) কে কষ্ট দেয়া বা মন্দ বলা নবীকে মন্দ বলঃ আবুল ইয়ালা ও বাজজার হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণনা করেন,

(দঃ) নবী قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذى عليا فقد اذانى

ইরশাদ করেন, যে আলী (রাঃ) কে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়।

ইমাম তিবরানী হাসান সনদে উম্মে সালমা হতে বর্ননা করেন,

قال من احب عليا فقد احبنى ومن احبنى فقد احب الله ومن أبغض عليا فقد ابغضنى ومن ابغضنى فقد ابغض الله۔

যে মওলা আলীকে ভালবাসে সে যেন আমাকে ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে সে যেন আল্লাহকে ভালবাসে। আর যে আলী (রাঃ) কে গালমন্দ করে সে যেন আমাকে গাল মন্দ করল।

আর যে আমাকে গালমন্দ করল সে আল্লহকেই গালমন্দ করল।

ইমাম আহমদ, হাকিম, সহী সনদে উম্মে সালমা হতে বর্ণনা করেন,

قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبنى

তিনি বলেন আমি রসুল (দঃ) হতে শুনেছি, যে হযরত আলী (রাঃ) কে গালি দেয় সে যেন আমাকেই গালি দিল।

মওলা আলীকে গালি দেয়া মুনাফিকদের চিহ্নঃ ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন,

والذى فلق الحبة وبرا النسمة انه لعهد النبى الامى الىّ انه لا يحبنى الامؤمن ولا يبغضنى الا منافق۔

নিশ্চয় আল্লাহর শপথ মুমিন ব্যতীত কেউ আমাকে ভালবাসেন না, আর মুনাফিক ব্যতীত কেউ আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করেনা। ইমাম তিরমিজি হযরত আবু সাইদ খুদরী হতে বর্ণনা করেন। كنا نعرف المنافقين ببغضهم علىا আমরা মওলা আলীর প্রতি শত্রুতার পোষণ দ্বারা মুনাফিকদের চিহ্নিত করতাম।

আল বাজজার হযরত সাদ হতে বর্ণনা করেন,

قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى لايحل لأحد ان يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك۔

নবী (দঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তোমার ও আমার অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন এ মসজিদ (নববী) এর সন্নিকটও না আসে।

হযরত আলী (রাঃ) এর শানে কুরআন অবতীর্ণঃ ইবনুল আসাকির হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস হতে বর্ণনা করেন,

نزلت فى على ثلثمائة اية হযরত আলী (রাঃ) এর কেন্দ্র করে তিনশ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম তাবরানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عن ابن عباس قال كانت لعلى ثمان عشرة منقبة ماكانت لأحد من هذه الأمة

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে বর্ণিত, হযরত আলী (রাঃ) এর আঠারটি প্রশংসা নামা রয়েছে, যা এ উম্মতের মধ্যে আর কারো নাই।

মওলা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কঠোরভাবে নিষেধঃ

عن ابى سعيد الخدورى رضى الله عنه قال اشتكى الناس عليا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال لا تشكوا عليا فوالله انه لأخيش فى ذالك الله أوفى سبيل الله۔

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে আনীত একদা কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে কিছু অবান্তর অভিযোগ উত্থাপন করলে নবী (দঃ) উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন যে, আলীর বিরুদ্ধে কিছু উত্থাপন করা তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা মওলা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবেনা। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ও তার দ্বীনের উপর দৃঢ়।

মওলা আলী (রাঃ) আবরারদের (খোদাভীরুদের) সর্দারঃ

عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال على امام البررة وقاتل الفجور منصور من نصره ومخذول من خذله۔

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, হযরত আলী (রাঃ) খোদাভীরুদের সর্দার এবং পাপ বিনাশকারী, তিনি বিজয়ী যাকে নেয়ামত সমূহ দেয়া হয়েছে এবং তিনি সাহায্য প্রাপ্ত যাকে সাহায্য করা হয়েছে। (হাকেম)

قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا سيد العرب فقالت عائشة الست سيد العرب' فقال انا سيد العالمين وهو سيدالعرب۔

রসুল (দঃ) ইরশাদ করেন ইনি হলেন (হযরত আলী) আরবদের তথা মুমীনদের সর্দার, হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে রসুল (দঃ) আপনি আরবদের সর্দার নন? নবী (দঃ) বললেন, আমি জগত সমূহের সর্দার আর তিনি আরদের সর্দার। (বায়হাকী)

শাহেনশাহে বেলায়ত মওলা আলী এর শানে এভাবে অনেক হাদিস, কুরআনের উক্তি পাওয়া যায়। যা গণনা করাও হয়ত সম্ভব নয়। এ প্রসংগে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) বলেন,

ماورد لأحدمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ماورد لعلى رضى الله عنه۔ (اخرجه الحاكم)

হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে সম্ভবত অন্য কোন সাহাবীর ফজিলত নিয়ে অত হাদিস বর্ণিত হয়নি। (তারিখুল খোলাফা, কৃত: আল্লামা সুয়ুতী)

মওলা আলীর কাব্য প্রতিভাঃ জাহেলী যুগের আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষের দিনে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ আলোকিত ভাবধারা, ভাষা শৈলী ও বর্ণনা ভংগি সহকারে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। এবং জাহেলী যুগের কবিদের এ কাব্য প্রতিভাকে ম্লান করে দিতে সমর্থ হয়। ইসলামী যুগে আরবের দু' চারজন বিশিষ্ট কবি ইসলামের ভাবধারায় কাব্য রচনা করেন। তাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রূপে মজুদ রয়েছে। তাদের মধ্যে মওলা আলী (রাঃ) অন্যতম। "দিওয়ানে আলী" নামে তাঁর একটি কাব্য গ্রন্থও রয়েছে। নাহজুল বালাগাহ গ্রন্থটি তাঁর বাণী সম্বলিত হলেও তা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। শিয়া সম্প্রদায় ঐ গ্রন্থে কিছু পরিবর্তন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

পরিশেষে মওলা আলী (রাঃ) এর শান-মান বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা, আল্লামা সায়েম চিশতী (রঃ) মওলা আলী (রাঃ) এর প্রশংসা করেছেন এভাবে যেমন, আলী (রাঃ) ফজিলত বর্ণনা করে কে শেষ করতে পারবে? কেননা মওলা আলী আল্লাহর শাণিত তরবারী, মওলা আলী আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় এক সত্তা, মওলা আলী (রাঃ) রসুল এর হাকীক, মওলা আলী ফাতেমা বতুলের স্বামী, মওলা আলীকে যারা ভালবাসেন আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, মওলা আলীর দুশমন মুরতাদ, মওলা আলী আমিরুল মু'মীনিন। মওলা আলী মুত্তাকিনদের সর্দার, তিনি পাপীদের সুপারিশকারী, তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা, তিনি দ্বীন দুনিয়া উভয়ের ওসিলা ইত্যাদি।

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

একক বিশ্ব সমাজ গঠনে ৮টি সূফিবাদী দিক নির্দেশনা

মূল: আব্দুল আজিজ সাইদ ও নাথান মিঃ ফাংকে

● অনুবাদ: এ এন এম এ মোমিন ●

বিশ্ব সমস্যা নিরসনে সমাজতন্ত্র বা অন্যান্য ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সূফিবাদ মানব জাতির জন্য শান্তির দিক নির্দেশনা দেখাতে পারে। বিশ্বের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ সময় বিজ্ঞানের সাহায্যে তাদের সমস্যা সমধানের চেষ্টা করেও সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হননি। কারণ আধুনিক সমাজে বস্তুবাদ ও সংস্কৃতিক বিভাজনের মধ্যে কোন বন্ধন রচনা করা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা এমন একটি আধ্যাত্মিক সম্পদের- যার একটি বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে- মাধ্যমে পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন কাঠামোর বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি। আমাদের মতে সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের নির্যাস হচ্ছে সূফিবাদ। তাই বর্তমান বিশ্ব ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে সূফিবাদ আমাদের নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম হতে পারে।

এই নিবন্ধে আমরা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সূফিবাদী সমাধানের উপায় ও পন্থা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। বিশ্বের সমস্যাদি সমাধান করতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৮টি সূফি নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে। সে সব হচ্ছে ঐতিহ্য, ধর্মীয় চেতনায় তৌহিদ, আধ্যাত্মিক শক্তির যথাযথ বিনিয়োগ তথা প্রয়োগ, সংস্কৃতির বৈচিত্রের মধ্যে এক বিশ্বের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সমাজ গঠন, প্রাচুর্যের অর্থনীতি, উন্নয়ন ও আধুনিকতার সমন্বয়ে মানবিকতা অর্জন ও রুগ্ন সমাজের নিরাময়। আমরা আশা করি যে, আমরা যে নীতি ও অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করবো তা পৃথিবীর বিবেকবান জনগোষ্ঠি ব্যাপকভাবে আলোচনা করবেন। অর্থাৎ বিশ্ব ব্যবস্থায় সূফিবাদ কী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এর বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে সূফিবাদের কী ধরণের দৃষ্টিভংগী বিশ্ব সমাজে উপস্থাপন করে তা সঠিকভাবে অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালাবেন।

১। জ্ঞানতত্ত্ব হিসাবে তৌহিদ: বিশ্ব রাজনীতি আলোচনায় এটাই যথার্থ যে, আমরা বিষয়টি তৌহিদ থেকে শুরু করব। কারণ ইসলাম ধর্মের মূল সূত্র তৌহিদ বা ওয়াহদ আল ওজুদ অর্থাৎ সব কিছুর একত্ব ভাবধারা যা সূফিদের প্রধান শিক্ষাও বটে। তাই আমাদের সূফি চিন্তাধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্ব প্রথম আলোচনা করতে হবে। পরবর্তীতে এর অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন সূফি সাধক বিশেষ করে সূফি সাধক ইবনে আরবী সূফিদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার মর্মকথা হলো বিশ্বের সকল প্রাণী ও বস্তু নিয়েই এই মহা বিশ্ব। যা একক হিসাবে পরিচালিত। এ কারণে বিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে এক সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই "মহা এককে"র অনুসন্ধান করা। সাধনা, অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকতার পথে চলার মাধ্যমে সেই মহা সত্যে পৌছাতে হবে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুক্তিই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

সূফিবাদ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে তৌহিদ এর সেই নীতিকে আবিষ্কার করার আহ্বান করেছে। সূফিবাদ এটাও মানুষকে আবিষ্কার করতে শিক্ষা দেয় যে, মানব সত্তা একই সাথে যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বিত সৃষ্টি। তাই মানুষের উচিত ব্যক্তি সত্তার বাস্তবতার সাথে সাথে সার্বিক মহাসত্তাকে অনুসন্ধান করা। এ দু'টি দিক যথাযথভাবে সমন্বিত হলে পূর্ণাঙ্গ মানবীয় সত্তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তৌহিদ এর একক ধারণায় আপাত দৃষ্টিতে বহুর অর্থাৎ বস্তু জগতে দৃশ্যমান বহুধরণের বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়না। ইবনে আরবী বলেন, বিশ্বে প্রতিটি সৃষ্টির সাথে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক আইনের ব্যাপকতা এটাই নির্দেশ করে যে, প্রতিটি ব্যক্তির এই বিশ্বে একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে।

সূফিবাদের দৃষ্টিতে জ্ঞান, বিষয় ও বস্তুর মধ্যে যে একটি মহান সত্তারও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা অনুসন্ধান করতে শিখায়। যতদিন পর্যন্ত দৃশ্যত এই দুই এর সম্পর্ক অনুধাবন করা সম্ভব না হয়, তত দিন পর্যন্ত মানুষ সন্দেহের দোলাচলে অবস্থান করতে থাকে। সাধারণভাবে পারস্পরিক এ সম্পর্ক অনুভব করা সম্ভব হয়না। ইবনে আরবী জ্ঞানকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, গভীরভাবে কোন কিছু জানা, যা আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভব বা অনুধাবন করে। তাই জ্ঞান আহরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রূপান্তরিত হওয়া, অর্থাৎ মিথ্যা থেকে মুক্ত হওয়া বিশেষ করে মিথ্যা বিভিন্নতা (False pluralism) থেকে মুক্ত হওয়া তথা প্রকৃত 'একক' তথা মহা ঐক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

রেনেসাঁ পরবর্তী যুগের নির্ভেজাল বস্তুবাদ চিন্তাধারা অকার্যকর বা বাতিল হিসাবে প্রমাণিত হওয়ায় জ্ঞান তত্ত্ব হিসাবে নতুন ধ্যান ধারণার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আমরা যতই বিজ্ঞানের গভীর থেকে গভীরতর জগতে

প্রবেশ করব ততই আমরা অনেক ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক জ্ঞান জগতের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবো। সূফিবাদ এ ধরণের অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তিবাদী তত্ত্ব ও তথ্যাদি একত্রীভূত করে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকৃত জ্ঞান হলো সব কিছু 'এক' এবং 'একক'। ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ ও প্রকাশস্থল হলো বস্তুনিচয়। আর বস্তু সামগ্রী ঐশী মহাজ্ঞানের মধ্যেই অবস্থান করে থাকে। 'একক সমগ্রতা' (Universal one) বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিকশিত। আর অংশ থেকেই আমরা পূর্ণতায় প্রবেশ করি।

২। **আধ্যাত্মিক শক্তির বা মানব প্রকৃতির বিনিয়োগঃ** সূফিবাদের মাধ্যমে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব চরিত্রের রহস্য ফলিত বিজ্ঞানের আওতা বহির্ভূত, আমাদের জীবনের গভীরে অনেক বাস্তবতাই রয়েছে বিশেষ করে বিবেক-বুদ্ধিবৃত্তি একটি গভীর রহস্যপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ যে বিষয়টি ও বৈশিষ্ট্যের কথা অর্থাৎ মানব হৃদয়ের অভ্যন্তরের সেই হাজার হাজার বছরের সূফি ঐতিহ্যের বিষয়টি অতি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করে আসছে, তা হলো স্রষ্টার সাথে মহামিলনের বিষয়। সূফি দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে মানুষের সমগ্র চিন্তা- চেতনায় সেই আগ্রাহ, উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়োজন, আর তা হলো আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আধ্যাত্মিক শক্তি পুনঃ প্রয়োগ তথা বিনিয়োগ বা ব্যবহার। ইতিহাসে আমরা যদিও তা সীমিত সময়ের জন্য দেখতে পাই। আমরা জানি বিভিন্ন সভ্যতায় ধর্মীয় উন্মাদনা কিভাবে সামাজিক প্রগতির অন্তরায় হিসাবে তার ভূমিকা রেখেছে। এ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিকৃত ও বিপথগামী আধ্যাত্মিকতা সমাজ জীবনে বিভ্রান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই একই শক্তি যদি সঠিক, ন্যায়নীতি, যৌক্তিক ও প্রগতিবাদী সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে সঠিকভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তাহলে এই আধ্যাত্মিক মহাশক্তি সমাজ জীবনে তার প্রভাব ফেলতে সক্ষম মর্মে অবশ্যই বিবেচনা করা যায়।

সূফিবাদ একই সাথে মানবীয় পবিত্র সত্তা ও মনুষ্যজনোচিত আচরণ-এই দুয়ের মধ্যে সুসমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মানবীয় পবিত্র সত্তার মনুষ্যজনোচিত আচরণ বলতে সকল প্রকার উপাস্য/প্রবৃত্তির ধ্বংস সাধন বুঝায়। এরই ফলশ্রুতিতে মানবীয় চরিত্র যে মহা সত্যনিষ্ঠ রূপ অর্জন করে, তাকেই সঠিক মানব জীবন হিসাবে অভিহিত করতে হবে। আবার মানব চরিত্রকে পবিত্র করে বলতে সেই পবিত্র কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি যা ব্যক্তিগতও নয় প্রয়োজনীয়ও নয়, আবার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ও নয়। যা এক ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি করে থাকি।

সূফিবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, এটি মানবের মূল সত্তা তথা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সাথে জড়িত। একই সাথে সূফিবাদের দৃষ্টিতে রাজনীতি সৃষ্টিগতভাবেই আধ্যাত্মিক। কারণ সামাজিক মূল্যবোধের বর্হিপ্রকাশ ঘটে জনজীবনের মাঝে। রাজনীতির সাথে পুনঃ সম্পর্ক স্থাপন একটি রাজনৈতিক অঙ্গনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু সূফিবাদ বিশ্বকে একক ও সম্মিলিত অর্থাৎ সবকিছুই সেই "মহা একক" এর অংশ হিসাবে বিবেচনা করে তাই এই মতবাদ দুঃখের সাথে এই বাস্তবতাও স্বীকার করে যে, আমাদের এই বিশ্ব শতধা বিভক্ত। আর মানবজাতির এই মহা দুঃখের কারণ হলো সে সৃষ্টির বৈচিত্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্নতার মধ্যে একতা বুঝতে না পারার ব্যর্থতা যা সে নিজেই সৃষ্টি করেছে। আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা বা অবদান হলো মানবীয় একত্ববোধের ধারণা গ্রহণ করার সক্ষমতা, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানব জীবনের সার্বিকতা তথা একত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। এটা এমন একটি ধারণা যার মাধ্যমে মানুষ সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে যে নীতি বা মতবাদ মানবজাতিকে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, লিংগের রহস্যের মাধ্যমে খণ্ড বিখণ্ড করে তারই বিপরীত।

৩। **সাংস্কৃতিক বহুত্ব-বৈচিত্রের মধ্যে একক বিশ্বের নাগরিকত্বঃ** সূফিবাদ সব সময় দাবী করে আসছে যে, সংস্কৃতি কখনও একক বা এক নয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী নির্বিবাদে একটি সমাজে সুখে বসবাস করতে পারে। Samuel Huntington (clashes of civilization পুস্তকের লেখক) ও তাঁর অনুগামীগণের ধারণা অনুযায়ী পাশ্চাত্যের দেশ সমূহের বাইরে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র বিশ্ব সংকট ও সংঘাতের মূল কারণ। পক্ষান্তরে সূফিবাদীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন যে, এই সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র কোনক্রমেই বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়। এই বিশ্বের কঠোর বাস্তবতা হলো এই বহুমাত্রিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব। তাই আমাদের এই পরিস্থিতির মধ্যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার কৌশল আয়ত্ব করতে শিখতে হবে। আমরা সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে "নিরাপত্তা হুমকি" হিসাবে বিবেচনা না করে যদি একটি বড় সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করতে শিখি তাহলেই আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবন যাত্রার ধারা পরিবর্তন হয়ে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। অর্থাৎ ভিন্ন সংস্কৃতির ব্যক্তিবর্গকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাদ দেওয়ার প্রবণতা সমাজ থেকে তিরোহিত হবে। ফলে আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং ভিন্ন সংস্কৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হব। আমরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, সমগ্র বিশ্বের সার্বিক স্বার্থেই এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে আমাদের প্রকৃত মানবীয় গুণাবলী অর্জন করার চাবিকাঠি তথা অস্তিত্ব।

বর্তমান বিশ্বে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দাবীর আলোকে আমাদের বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির কিছুটা হলেও সংযোগ বা যোগাযোগের অপরিহার্যতা রয়েছে। কারণ বিশ্ব সমস্যাগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বৈচিত্রের মধ্যে একত্ব তথা বহুত্বের মধ্যে একত্ব এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ব নাগরিক এর মর্যাদায় উন্নীত হতে হলে, বিভিন্ন জাতি সত্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। তা না করা হলে আমরা বিভিন্ন জাতি সত্তার অথবা সংস্কৃতির জনগোষ্ঠির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্বের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে অবশ্যই ব্যর্থ হবো। ফলে অমূল্য বিশ্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখবো। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক বহুত্বের কারণে একত্রে কাজ করার ব্যাপারে অনীহা দেখা যায়। এর মূল কারণ হলো আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ধরণের অনমনীয়তা বিদ্যমান। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পরিচিতির সংকট রয়েছে। বর্তমানে আমাদের জন্য যেটি প্রয়োজন তা হলো, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন, যা আমাদের বিশ্ব নাগরিক হতে সহায়তা করবে। বিশ্ব নাগরিকের অবশ্য বহুমাত্রিক ও বহুমুখী বিবেচনাবোধ থাকতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জ্ঞান আহরণ এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে সত্য সুন্দর ও নিয়ম পদ্ধতি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার প্রথাগত সীমাবদ্ধতা জয় করা সম্ভব হয়। জ্ঞানই আমাদের বিভিন্ন ধরণের অলীক ধারণা ও বিভ্রান্তিকর জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটাবে। ফলে আমাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে, যাতে আমরা সহজেই বিভিন্ন সভ্যতার চিন্তাধারা ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশল শিখার ব্যাপারে অধিকতর উদার ও মুক্তমনা হই। ফলে তা আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও বহুমাত্রিক জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশ বা সাংস্কৃতিক চিন্তার বা জ্ঞানের বিভিন্নতা ও বৈচিত্রকে পরস্পর নির্ভরশীল বা পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

পরস্পর সহাবস্থানের মাধ্যমে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় মতই হলো বহুত্ব বা বহুমাত্রিকতা, বিশ্ব নাগরিক সৃষ্টি ও অধিকতর মানবীয় ন্যায়নীতি ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে এর প্রকৃত যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। এই বিশ্বে বিভিন্ন ধরণের ভাষা, গোত্রীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তার ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য সব কিছুই অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা ও মর্যাদা রয়েছে, যা সার্বিক তথা সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা বুঝার জন্য অপরিহার্য। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নব নব বুদ্ধিবৃত্তিক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, যখনই যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন ধরণের চিন্তাধারা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তখনই একটি সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, পাশ্চাত্যের অন্ধকার যুগের অবসান হয়েছে তখনই মুসলিম সভ্যতার জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। আন্দালুসিয়ায় মুসলিম, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সহাবস্থানের মাধ্যমে মধ্যযুগে এটিকে জ্ঞান নগরীর রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে ছিল, অনুরূপভাবে দশ শতকে আব্বাসীয়দের রাজধানী বাগদাদে ইহুদী, মুসলিম ও খৃষ্টান বুদ্ধিজীবীগণ একত্রিত হয়ে সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন, যা জগতে এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছিল। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই পুনর্নির্মাণ ও এর কার্যক্রমে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে এমনভাবে সংস্কার করা সম্ভব যাতে প্রত্যেকটি মানুষ বিশ্ব ব্যবস্থায় তার নিজের স্থান খুঁজে পায়। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের ফলে একজন বিশ্ব নাগরিক নিজের স্বতন্ত্র ও পৃথক সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি না দিয়েও বিশ্ব নাগরিক হিসাবে তার স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হতে শিখে।

এটা একটি স্থির নিশ্চিত বিষয় যে, পৃথিবীর সকল ভাষায় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও সত্য বিরাজমান এই শিক্ষা, অনুসন্ধান ও গবেষণা করার অর্থ এটা নয় যে, নিজের মাতৃভাষাকে গুরুত্ব না দেওয়া বা তা জলাঞ্জলি দেওয়া। তাই একজন বিশ্ব নাগরিককে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে, তাদেরকে অতীতের সকল প্রকার মূল্যবোধকে শ্রদ্ধার সাথে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতের সকল ধরণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। ধর্মের সামাজিক পরিসীমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নিহিত থাকে, আর সূফিবাদের শিক্ষা এটাই। আমাদের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যসমূহ স্রষ্টার নির্দেশিত বিধি বিধান যথাযথভাবে মেনে চলে। আর এটাই হলো মানবজাতির জন্য সবেচেয়ে বড় শক্তি ও সম্ভাবনা।

(চলবে)

শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ

মূল : এম. ফেতুল্লাহ্ গুলেন
●অনুবাদ: অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান●

[এম. ফেতুল্লাহ্ গুলেন বর্তমান যুগের একজন প্রভাবশালী ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত লেখক, বাগ্মী ও আদর্শ প্রচারক এবং সমাজ সংস্কারক। তুরস্কের এ মহান পন্ডিত লেখক বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬০টি। তিনি ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণী– যা পুরনো হয়েও চির আধুনিক, যা মানবিকতার সকল দিককে উম্মোচিত করেও গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক, যা ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করেও সমষ্টির স্বার্থকে সংরক্ষণ করে, যা একাধারে ব্যক্তির মুক্তিকামী হয়েও বিশ্ব মানবতার জাগরণকামী, যা দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ভারসাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্রষ্টা প্রদত্ত হাতিয়ার - তারই স্বরূপ উম্মোচন করেন একান্ত এক নিজস্ব ভঙ্গীতে লেখায় ও বক্তৃতায়। সে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে বাংলাদেশী পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাসিক আলোক ধারার পক্ষ থেকে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হলো।]

শিক্ষার তৎকালীন পরিবেশ ঃ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সময় শিক্ষার পরিবেশ মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নোক্ত কুরআনের বাণী বিবেচনায় আনা যায় ঃ

এরশাদ হচ্ছে "তিনি (আল্লাহ্‌তা'লা) উম্মিদের মধ্য হতে একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করে শোনান ও পবিত্র করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র কুরআন এবং হিক্‌মত শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহীতে ছিল।" (৬২ঃ২)

উল্লিখিত আয়াতে কিছু শব্দ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে স্রষ্টাকে 'নাম পুরুষ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ অজ্ঞ আদি আরব গোষ্ঠী আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে। যেহেতু স্রষ্টা বলতে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে তাদের ধারণা ছিল না, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তাদের অজ্ঞতার প্রকৃতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেন এবং তারা আল্লাহ্‌র নিকট হতে এত দূরত্বে অবস্থান করছিল যে আল্লাহ্ কর্তৃক তারা সরাসরি সম্বোধিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলনা।

মহান রাব্বুল আলামিন আরব গোষ্ঠীকে 'উম্মি' হিসেবে সম্বোধন করেছেন। যদিও তারা সকলেই অজ্ঞ ছিল না, তথাপি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল (দঃ) সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। আল্লাহ্ তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে এই অজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকট এমন একজন রাসূল (দঃ) পাঠিয়েছেন যিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং উত্তম চরিত্র ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সমপন্ন। নবীজী তাঁর বিরল ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মানবজাতিকে এমন শিক্ষা প্রদান করেছেন, যার ফলে তিনি বিবেচিত হয়েছেন বিশ্ব মানবতার রক্ষক হিসেবে।

'তাদের মধ্য হতে' কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আরবজাতিদের মধ্য হতে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞতার যুগের নন (ইসলামপূর্ব আরবের)। নবীজীর পার্থিব অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়ার আবশ্যকতা ছিল এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা নবীজীকে প্রয়োজনীয় পার্থিব জ্ঞানদান করার প্রয়োজনীয় দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ্ চাইলে নবীজীকে ঐ মানবগোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন করে একাকী শিক্ষা দিতে পারতেন এবং পুরো নিরক্ষর জাতির জন্য শিক্ষক বানাতে পারতেন।

কুরআনের বাণী, "তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন" কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র কুরআনের অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করেছেন। পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা মানবজাতিকে কিভাবে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানবে রূপান্তর করা যায় সে ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে উচ্চ মার্গের শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে এই বিশ্ব জগতকে তাদের নিকট তুলে ধরেছেন এবং কিভাবে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, জীবন চলার পথে সুষম ও দৃষ্টান্তমূলক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় সে

শিক্ষা দিয়েছেন।

"যদিও তারা পূর্বে ভুলের মধ্যে ছিল" বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ্ পাক ইঙ্গিত করেন যে, মহান রাব্বুল আ'লামিন তাদেরকে পাপমুক্ত করবেন এবং তারা বিপথে গেলেও তাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ্তা'লা এসবকিছু বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর প্রেরিত উম্মি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এবং এমনকি আজ পর্যন্ত এই মহান গ্রন্থ অগণিত বিজ্ঞ বিজ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ধর্মযাজকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে।

নবীজীর আগমণের পর শত শত বছর ধরে মানবতার পতাকা ওড়ে চলেছে। অতীত এবং বর্তমানে যারা তাঁকে অনুসরণ করেছেন তাঁরা পরিণত হয়েছেন সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে এবং রপ্ত করতে পেরেছেন জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখাকে। অতীত এবং বর্তমানে যারা আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উপনীত হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে চলার পথের পাথেয় হিসেবে নবীজীর পদচিহ্ন অবলম্বন করেছেন এবং এজন্য তাঁরা নবীজীকে এই বলে দোয়া করেছেন, "আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন"।

নিকট ভবিষ্যতে তাঁরা আবারো অনুরূপ আচরণ করবেন। তথাকথিত সকল মৌলিকধারণা একের পর এক বিলীন হয়ে যাবে। মোমবাতি ফুরিয়ে যাবে, হিদায়তের একমাত্র "সূর্য", পবিত্র কুরআন অবশিষ্ট থেকে যাবে, যেটা কখনো অস্ত যাবে না। পবিত্র কুরআনের পতাকা দিগ-দিগন্তে উড়বে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় এটার নাগাল পাওয়ার জন্য তাদের গলায় পেঁচানো গোমরাহীর শিকল ভেঙ্গে ছুটোছুটি করবে।

উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানঃ আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং উনি যা মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তা তাঁর আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অতঃপর তিনি তাঁর আচরিত কর্মকাণ্ডকে ভাষায় রূপদান করেছেন। আল্লাহর প্রতি কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, বিনয়ী হতে হবে, মনের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে, কিভাবে মাথা নত করতে হবে, কিভাবে ইবাদতের জন্য বসতে হবে এবং কিভাবে গভীর রজনীতে জাগ্রত থেকে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করতে হবে এই সকল পদ্ধতি প্রথমে তিনি নিজে নিজে করেছেন এবং পরে তা অন্যকে শিখিয়েছেন। ফলে তিনি যা প্রচার করেছেন তা সংগে সংগে মানুষ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর অমীয় বাণী তাঁর অনুসারীরা হৃদয়ে গেঁথে রেখেছেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর মানুষ সব জায়গায় নবীজীর প্রচারিত মানবতা প্রকৃষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাধনার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও তাঁর নৈকট্যলাভের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা ঐ পথে যাত্রাও শুরু করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ভবিষ্যতেও এ যাত্রা অব্যাহত থাকবে। হযরত রাসুল (দঃ) এর গৃহে একটি চিরন্তন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিব্যক্তি বিরাজমান ছিল। নবীজী (দঃ)কে যারা একনজর দেখেছেন তাঁরা বেহেশতের পরম শান্তি অনুভব করেছেন এবং জাহান্নামের দুর্বিসহ যন্ত্রণা আঁচ করতে পেরেছেন। ইবাদতের সময় তিনি জাহান্নামের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এদিক ঐদিক ছুটাছুটি করতেন এবং পাখায় উড়ে বেহেশতে গমণের ইচ্ছা পোষণ করতেন। যারা নবীজী (দঃ)কে আল্লাহর স্মরণে দেখেছেন তাদের মধ্যে একজন ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেন, "যখন নবীজী (দঃ) ইবাদতে মগ্ন ছিলেন তখন একটি উত্তম পাত্রে বুদবুদ শব্দ শোনা গেল" তিনি সবসময় দগ্ধ হৃদয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) নবীজী (দঃ) কে মহাপ্রভু আল্লাহর উপস্থিতিতে নিজেকে প্রায়শ কাঁপতে দেখেছেন।

তাঁর আচার আচরণ তাঁর চারপাশের লোকদের অনুপ্রাণিত এবং লাভবান করেছে। প্রত্যেক নবীর সন্তান সন্ততি এবং স্ত্রীগণের এরূপ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভয় ছিল। এবং নবীগণ সেরূপে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন।

সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন এবং যে কাজ তারা নিজেরা করেছেন এবং যে কাজে তাঁরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা তাঁদের আচার আচরণের মাধ্যমে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা একজন মানুষের আচার আচরণের দ্বারা তাঁর প্রভাবকে পরিমাপ করতে পারি। অথবা তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখনও তাঁর অবস্থান যাচাই করার জন্য তাঁর আচার আচরণকে আমরা বিবেচনায় আনতে পারি।

যদি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষকের লব্ধ জ্ঞান একত্রিত করা হয় তা একজন নবীর জ্ঞানের সমকক্ষ হতে পারবেনা। তাঁর অনেক অনুসারীদের মধ্যে অনেকেই নিজ গোত্রের নিকট সূর্য চন্দ্র এবং তারা রূপে উদিত হয়েছেন। নবীজী (দঃ) তাঁর সঙ্গীদের এত দক্ষতার সাথে গড়ে তুলেছেন যে, তাদের কেউই ধর্মদ্রোহী হয়নি। তাঁদের কোন সন্তান সন্ততিও কখনো ধর্মদ্রোহী ছিলনা যেটা তাঁর অতুলনীয় কৃতিত্ব।

অনেক ঋষি মনিষীদের পরিবারে এবং তাঁদের সন্তান সন্ততিদের মাঝে ধর্মদ্রোহিতা এবং নৈতিকতার পদস্খলন ঘটেছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পরিবারের কোন সদস্য তাঁদের নিজ গৃহের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। যদি এর ব্যতিক্রম দুই একটা আমাদের এবং ইতিহাসের অজানা থেকে থাকে তারা নিষ্ক্রিয় বটে।

ইসলাম সকল মানবীয় গুণের আধার ঃ পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের মর্মানুযায়ী মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর চিরন্তন শিক্ষাদান পদ্ধতি আমাদেরকে কেবল পাপ কিংবা কু-প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিবৃত্ত করে না বরং মানব হৃদয়, আত্মা, স্পৃহা ইত্যাদিকে পরিশুদ্ধ করতে সহায়তা করে। নবীজী মানবের মানবীয় বৈশিষ্ট্য সমূহকে যথার্থ বিবেচনা করে তাঁর গুপ্ত প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানবকে সুউচ্চ অবস্থানে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের চিরন্তন সত্যবাণীসমূহ দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত। তদুপরি নবীজী (দঃ) এর মাধ্যমে প্রচারিত কুরআনের বাণীসমূহ আমাদের সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চেতনাকে স্পর্শ করে। পবিত্র কুরআনের তথা নবীজীর শিক্ষা মানুষের মনে প্রেম ও করুণা জাগ্রত করে। এ চেতনা মানবকে এমন এক ভাল অবস্থানে নিয়ে যায় যা আমাদের ভাবনার বাইরে। নবীজীর চিরন্তন আহ্বান কেবল শিষ্টাচার এবং আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ নয়, অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, শিক্ষা, ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি বিষয়েও তিনি (দঃ) আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে শিখিয়েছেন অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন পরিচালনাসহ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি। নবীজীর শিক্ষা গ্রহণ করে মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে অনেকে পরিণত হয়েছেন দক্ষ প্রশাসক, বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ এবং অদ্বিতীয় সমর নায়ক। মানবতার সাফল্যে নবীজীর দেয়া এ শিক্ষা পদ্ধতিতে যদি কোন ধরণের ঘাটতি থাকত তাহলে নবীজীর প্রচারিত ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিগুলো মানুষের হৃদয়ে এত বেশি রেখাপাত করত না। নবীজী (দঃ) বলেন, "আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত হল এই ঃ এক ব্যক্তি একটি বাসস্থান তৈরি করল যেটা ছিল খুব সুন্দর ও দেখতে শোভনীয় এবং সেটি সজ্জিত করল কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য রইল। চতুর্দিকে ঘুরে মানুষ তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল এত সুন্দর ইমারতের নির্মাণ কাজ কখন শেষ হবে? যিনি এই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন আমিই সেই ব্যক্তি। আমার পরে এ কাঠামো নির্মাণে আর কোন ত্রুটি রইল না।"

পবিত্র কুরআন নবীজীর উল্লিখিত বাণীকে সত্যায়ন করে ঘোষণা দিচ্ছে, "আজ আমি তোমাদের নিকট তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম।" (৫ঃ৩)

সংক্ষেপে বলা যায় মানুষের চলার পথে সকল ভুল-ভ্রান্তি দূর করে মানুষের চাহিদার নিরিখে যেসব বিষয়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে সেসব বিষয়ে নবীজী (দঃ) পরিপূর্ণতা এনেছেন।

পূর্বে সকল নবীকে নির্দিষ্ট কোন গোত্র কিংবা নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। যেহেতু আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কে এবং তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সর্বকালের ও সর্বযুগের জন্য চিরন্তন আবেদন সমৃদ্ধ এবং আবেগঘন বিশ্বময়তার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে সফলতা দান করেছেন সেহেতু এটা প্রত্যেক মানুষকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব নবীজী (দঃ) এর মহান আহ্বানের ধরণ কিংবা আচরণের ত্রুটি বিচ্যুতি না খুঁজে নিজ জীবনকে সত্য ও সুন্দর পথে পরিচালিত করার জন্য প্রত্যেক মানুষের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আমাদের নবীজী (দঃ) এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি দ্বীনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণতা দানকারী এবং সর্বোপরি সকল অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকারী রূপে বিবেচিত।

তিনি অজ্ঞ ও বর্বর জাতিকে পরিণত করেছেন অতিশয় দয়াবান ও আধ্যাত্মিক চেতনাসমৃদ্ধ জাতিতে। যাদের মধ্য হতে সৃষ্টি হয়েছে সফল রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষক ও কালজয়ী সভ্যজাতি। একজন শিক্ষকের সফলতা নির্ভর করে তাঁর শিক্ষার গুণগত, পরিমাণগত ও বহুমুখী প্রতিভার ওপর যা তাঁর ছাত্রগণ অনায়াসে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। নবীজীর অন্তর্ধানের পূর্বে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান কর্মসূচী সুদূর মিশর থেকে ইরান, ইয়েমেন, ইন্দো-ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। যারা নবীজী (দঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁরা পরবর্তী শতাব্দীতে বিভিন্ন কৃষ্টি, সভ্যতা পরিহার করে চিরন্তন সভ্যতা তথা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একজন শিক্ষকের মহত্ত্ব নির্ভর করে তাঁর দক্ষ শিক্ষাদানের উপর যেটা আবহমান কাল ধরে চলতে থাকে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সারা বিশ্বের মানুষ নবীজী (দঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে অধিকাংশ মানুষ

ইসলামের ছায়াতলে আসবে খুব শীঘ্রই।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) এর আগমণ ঘটেছিল আদিম বর্বর জাতির মধ্যে। তারা মদ পান, জুয়া ও নির্লজ্জভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। পতিতাবৃত্তিকে তারা আইনসিদ্ধ মনে করত এবং পতিতালয়গুলোতে বিশেষ পতাকা উড্ডয়ন করে চিহ্নিত করে রাখত। অশ্লীলতার মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে একজন মানুষ নিজেকে মানব পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করত। মানুষের মধ্যে হানাহানি লেগেই থাকত এবং কেউ তাদেরকে কখনো একত্রিত করে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করতে পারে নি। আরবে সব ধরণের গর্হিত কাজ বিদ্যমান ছিল। তবে আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) সব গর্হিত কাজের মূলোৎপাটন করেছেন এবং সকল অন্যায়, অনাচার মানবিক মূল্যবোধ এবং মানবীয় গুণাবলী দ্বারা এমনভাবে চাপা পড়েছিল যে মানুষ পরিণত হয়েছিল সভ্য পৃথিবীর নেতা এবং শিক্ষকে। এমনকি আজ পর্যন্ত সেই সকল সফল ব্যক্তিদের নাগাল পর্যন্ত আমরা পৌছতে পারিনি। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী আইজ্যাক ট্যালর, রবার্ট ব্রিফল্ট, জন ড্যাভেনফোর্ট, এম. পিকতল, লামার্থিন এর মত ব্যক্তিবর্গ একথা স্বীকার করেছেন।

আল্লাহ্‌ জড়বস্তু হতে জীববস্তু সৃষ্টি করেন। তিনি মাটি ও পাথরে প্রাণ সঞ্চার করেন। হযরত রাসূল (দঃ) কয়লা, পাথর, মাটি এবং তামাকে স্বর্ণ ও হীরায় পরিণত করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃদিঃ), হযরত উমর (রাঃদিঃ), হযরত উসমান (রাঃদিঃ), হযরত আলী (রাঃদিঃ), হযরত খালিদ (রাঃদিঃ), উখবা বিন নাফী (রাঃদিঃ) হযরত তারিক বিন যায়ীদ, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ), হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), হযরত আবু হানিফা (রহঃ), হযরত মুহীউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহঃ), হযরত আল বিরুনী (রহঃ), যাহ্‌রাভী (রহঃ) এবং আরো শত শত, হাজার হাজার মহান ব্যক্তিত্বদের বিষয় বিবেচনা করা যায় যারা নবীজীর প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করে সফলতা অর্জন করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কখনই মানব কল্যাণের অন্তরায় কোন কাজ করেন নি। তিনি মানবের মাঝে লুকায়িত গুণাবলীকে লালন করে তা দ্বারা দুর্বল কিংবা খারাপ দিকগুলোকে দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেছেন। সেজন্য একজন মহামণীষী বলেন ঃ "উমরের মাঝে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও মহৎ ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর এত ক্ষমতাধর হওয়া সত্ত্বেও অতি মার্জিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। যিনি নিজ জানামতে একটি পিঁপড়ার উপর দিয়েও হেঁটে যান নি, এমন কি একটি ফড়িং পর্যন্ত মারেননি।

সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ নিয়মিত আলোচনা সভা, সম্মেলনের ঘোষণা সত্ত্বেও আমরা ধূমপানের মত সামান্য একটি বদঅভ্যাস ছাড়তে পারি না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ধূমপান শ্বাসনালী, মুখে, ফুসফুসে, স্বরযন্ত্র ও গলবিলে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। হযরত রসূল (দঃ) অসংখ্য বদঅভ্যাসকে ভাল এবং সৌষ্ঠ গুণ দ্বারা নিবৃত করেছেন। যারা এগুলো দেখেছেন তারা বলেছেন, "হায় আল্লাহ্‌! নবীজী (দঃ) এর অনুসারীগণ ফেরেশ্‌তাকুলের চেয়েও উর্ধ্বে"। যখন এমন লোক সকল জাহান্নামের উপর দিয়ে চার দিকে তাদের ঝলকানো নূরের তজল্লী দ্বারা সাঁকো পার হবেন তখন ফিরিশ্‌তাকুল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, "আসলে তারা কারা, তারা কী কোন নবী না ফিরিশ্‌তা?" বস্তুত তারা নবীও নন, ফিরিশতাও নন, তাঁরা নবী (দঃ) - এর অনুসারী জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ।

প্রত্যেক মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ছিল অতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তাদের সকল মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন এবং তিনি তাঁর গোত্রের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত লোকদের স্বীয় অবস্থা হতে তুলে এনে উন্নত সদগুণে গুণান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবীজীর এ ধরণের প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও দক্ষতা তাঁর মহত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ।

সুশিক্ষার উপাদান সমূহঃ একজন প্রকৃত শিক্ষকের অনেক গুণাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যকঃ

প্রথম গুণঃ একজন মানুষের মনের স্পৃহা, প্রেরণা ও সত্তার সকল দিককে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সঠিক পন্থায় উৎকৃষ্ট অবস্থায় তুলে আনা। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে যে পাপতাড়িত নফ্‌স মানবকে পশুর মত গলায় দড়ি দিয়ে টেনে টেনে যে যেখানে যেতে চায় সেখানে নিয়ে যায় এবং লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করে যেন তার আদেশমত চলে। বস্তুতঃ নফ্‌স মানুষের আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সামর্থ্যকে অবজ্ঞা করে কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা ও কুভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে চায়।

পবিত্র কুরআনে ইউসুফ নবীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "নফ্‌স মন্দকাজের প্ররোচনা দিয়ে থাকে সেই নফ্‌স ব্যতীত যার প্রতি আমার প্রতিপালক রহম করেন। নিশ্চয়ই আমার রব অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।" (১২:৫৩) মন্দকাজের তাড়না নফ্‌সের নিজস্ব ধারায় গতিময়। সে যাই হউক, মানবকুল ইবাদত বন্দেগী এবং নিয়মনীতির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তাকে এমন উচ্চাসনে নিয়ে যায় যেখানে তার

অপকর্মের জন্য নিজকে নিজে অভিযুক্ত করে। তখন আল্লাহ বলেন, "হে শান্তিময় আত্মা, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।" (৮৯:২৭-২৮) ব্যক্তিসত্তা যখন শান্তিময় উচ্চস্থানে আরোহণ করে তখন আত্মা সত্যিকারের পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। যারা পাপ পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে আসতে পারে তাদের অবস্থান আল্লাহর খুব নিকটে হয়ে যায়। যখন আপনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। কারণ তারা স্বচ্ছ আয়নার মত যেখানে আল্লাহপাকের ছিফতের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। নবীজী (দঃ) পরিচালিত প্রশিক্ষণে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এ উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ প্রশিক্ষণের অনুসারী হয়েছিলেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করার প্রয়াস অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় গুণঃ একটি শিক্ষার পদ্ধতি এটার বিশ্বময়তা, বোধগম্যতা এবং শিক্ষার্থীদের গুণগত মান দ্বারা বিচার করা হয়ে থাকে। নবীজী (দঃ) এর শিক্ষার্থীগণ তাঁর বাণী সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। নবীজী (দঃ) যে বাণী প্রচার করেছিলেন তার ধরণ ও প্রকৃতি ছিল চিরন্তন। এ শিক্ষা পদ্ধতি ছিল সর্বকালের এবং সর্বস্থানের জন্য প্রযোজ্য এবং দেখা গেল যে ধর্ম, গোত্র এবং বয়স নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে আধুনিক মরক্কো, স্পেন, ফিলিপাইন, রাশিয়া এবং আফ্রিকার কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নবীজী (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই রীতিনীতিগুলো বৈধতা পেল। অসংখ্য অভ্যুত্থান, পরিবর্তন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, বৌদ্ধিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লব সাধিত হওয়া সত্ত্বেও নবীজী (দঃ) এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অপরিবর্তিত ও অদ্বিতীয় রয়ে গেল এবং এটাই ভবিষ্যৎ মানবজাতির আশা এবং প্রত্যাশার আলো দেখাতে সক্ষম হল।

তৃতীয় গুণঃ একটি শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সুপরিবর্তন আনয়নে কতটুকু সক্ষম তা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। ধূমপানের উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল। পূর্বে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল যে কিভাবে দুই তিন দশকের মধ্যে নবীজী (দঃ) প্রচারিত ধর্ম ইসলাম এবং তাঁর দেয়া প্রশিক্ষণাদি আরবে বিস্তার লাভ করেছিল। যারা তাকে অস্বীকার করে এবং তার নবুয়্যত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে তাদের সাথে আমরা চ্যালেঞ্জ তুলে বলতে চাই যে, তারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে অন্ততঃ একশত বছরের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব এবং এমন প্রশিক্ষণ তালাশ করে দেখান যেটা চৌদ্দশত বছর পূর্বে প্রচারিত নবীজীর ধর্মের সমতুল্য হবে। তাদেরকে চাহিদামত প্রয়োজনীয় সকল সহযোগীতা ও বিশেষজ্ঞ দেয়া যেতে পারে অতঃপর আমরা তাদের ফল দেখার জন্য অপেক্ষা করব।

যখন নবীজী (দঃ) তাঁর বাণী প্রচার করছিলেন তখন পুরো আরব তার প্রতিবেশীদের নিকট বড় একটি মরুভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় সে অঞ্চলটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাদপদ এলাকা, যে অঞ্চলে নবীজী (দঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে কোন সামাজিক মূল্যবোধ তথা বৌদ্ধিক উন্নতির মত উল্লেখ করার কিছুই ছিল না। মানুষ তখন কুসংস্কার, বর্বরতা, কু-প্রথা, নৈতিক অবক্ষয়ের মত চরম মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে দাসত্ব বরণ করেছিল। মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার এবং যে কোন বিবেচনায় সামাজিক অপরাধের সামীল এমন গর্হীত কাজে তারা লিপ্ত থাকত। যৌনকর্মীরা বেশ্যাবৃত্তিকে প্রচার করার জন্য তাদের ঘরের দরজায় বিশেষ ধরনের পতাকা টাঙ্গিয়ে দিত।

এটা ছিল আইন ও সরকারবিহীন এক জনপদ। তখন সেখানে জোর যার মুল্লুক তার এমন অবস্থা বিরাজ করছিল, যেমনটি এখন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দেখা যায়। লুটতরাজ, খুনখারাপী এবং অগ্নুৎপাত ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যে কোন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোত্রগুলো আন্তঃকোন্দলে জড়িয়ে পড়ত এবং মাঝে মাঝে সেটা পুরো উপসাপরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের রূপ নিত।

আমাদের নবীজী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আগমণ ঘটেছিল এরূপ মানবগোষ্ঠীর মাঝে। আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি ধর্ম প্রচার করেছিলেন তদ্বারা হ্রাস পেয়েছিল বর্বরতা, দাসত্ব, আরব্য পাশবিকতা এবং তারা অর্জন করেছিলেন প্রশংসনীয় বিরল সব গুণাবলী যেগুলো তাদের পরিণত করেছিল বিশ্বের শিক্ষকে। তিনি শারীরিক আঘাত কিংবা সামরিক শাসনের মাধ্যমে তাদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেননি বরং তাদের অন্তরের ভালবাসা অর্জনের মাধ্যমে অতি আপনজন হয়ে আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও হৃদয় মনের শিক্ষক রূপে সুপ্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সুপথে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান বদ অভ্যাসগুলোকে দূর করে এমনসব বিরল গুণাবলী প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যদ্বারা তারা তাঁর সব অনুসারীদের মধ্যে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন।

গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.)'র বেলায়তী প্রভাব বিশ্বব্যাপী শুধু মাত্র পূর্বাঞ্চলের জন্য নয়

● মুফতী ছালেহ সুফিয়ান ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডারী ●

হাম্‌দ ও দরূদ-সালাম ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজ দয়ায় সমগ্র জগৎকে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উছিলায় সৃষ্টি করে আমাদেরকে তাঁরই উম্মত হওয়ার সুযোগ দান করেন। অসংখ্য দরূদ-সালাম শফিউল মুজনিবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর যিনি নিজ আহলে বাইত ও অলী আল্লাহগণকে আমাদের জন্য অনুকরণীয় হিসাবে ইরশাদ করছেন।

পবিত্র কুরআনের দিক নির্দেশনা ঃ

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون উচ্চারণ ঃ **আলা-ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা-খাউফুন আলাইহিম্‌ ওয়ালা-হুম্‌ ইয়াহ্‌ জানুন** (সূরা ইউনুছ ৬২ নং আয়াত)। অর্থাৎ ঃ খবরদার! অবশ্যই **অলী আল্লাহদের** কোন ভয় নাই এবং তাঁদের কোন চিন্তাও নাই। **সম্মানিত পাঠক,** উক্ত আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেই দিক নির্দেশনা (ইঙ্গিত) দিয়েছেন তা হল যারা শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নুদব, মুবাহসহ যাবতীয় নফল ইবাদত সম্পাদন করে তাছাউফের (শরীয়ত, ত্বরীক্বত, হাক্বীক্বত, মারিফাত) যাবতীয় মক্বাম (স্তর) পার হয়ে আল্লাহর বেলায়ত (নৈকট্য) হাছেল করেন তাঁদের সংখ্যা যে একাধিক (যাঁদের একজন ইমাম বা গাউসুল আ'যম আছেন) তা اولياء الله (আউলিয়া আল্লাহি) বহুবচন শব্দ দ্বারা দিক নির্দেশনা বা ইঙ্গিত দেন।

পবিত্র হাদিসে কুদসির দিক নির্দেশনা ঃ

ان اوليائى تحت رداء عظمتى لايعرفهم غيرى উচ্চারণ ঃ **ইন্না আউলিয়া-য়ী তাহ্‌তা রিদায়ী আযমতি লা ইয়া' রিফুহুম গাইরী।** অর্থাৎ ঃ আমার ওলীগণ আমার কুদরতি চাদরের নিচে, তাঁদেরকে আমি ব্যতীত কেউ চিনে না। (আয়না-এ-বারী ১৯ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ ২০০৭) এ হাদীস শরীফেও **'আউলিয়া'** বহু বচন শব্দ দ্বারা প্রমাণ করেন তাঁদের একজন ইমাম (তাছাউফের দৃষ্টিতে গাউসুল আ'যম) আছেন।

গাউসুল আ'যমের আভিধানিক অর্থ ঃ সম্মানিত ত্বরীক্বতের নিখুঁত পাঠকমন্ডলী আপনারা অবশ্যই জানেন যে, প্রত্যেক শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ থাকে। এখন আপনাদের সমীপে **"গাউসুল আ'যম"** ও **"মাশ্‌রেক্বী"** শব্দের আভিধানিক অর্থ আলহাজ্ব মৌলভি ফিরোজুদ্দীন প্রণীত (আছেফ বুক ডিপু ৪২২ মিটিয়া মহল জামে মসজিদ দিল্লি (৬) হতে ২০০৮ সালে প্রকাশিত) ফিরুজুল্লুগাত, এর ৯১৮ পৃষ্ঠায় যেই রকম আছে তা হুবহু দেওয়া হল। গাউস আরবী শব্দ, পুংলিঙ্গ যার ১ম অর্থ ঃ ফরিয়াদকু পৌঁছনে ওয়ালা (আবেদন গ্রহণকারী) ২য় অর্থ ঃ আহলে ইসলাম মে বেলায়ত ইলাহীকা এক দরজা (মুসলিমদের দৃষ্টিতে আল্লাহর নৈকট্য (বেলায়ত)'র একটি ধাপ (মক্বাম)। গাউসুল আ'যম, গাউসুস্‌ সাক্বালাইন, যার ১ম অর্থঃ শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বি.) বড়ে পীর সাহেব কা লক্বব। ২য় অর্থ ঃ বড়া ফরিয়া দরস (বড় আবেদন গ্রহণকারী)। একই ভাবে "আলমুনজেদ" নামক খ্যাত আরবী অভিধানের ৭২১ পৃষ্ঠায় আছে; গাসাহু, ইয়াগুসাহু, গাউসান্‌, ওয়া ইগাসাহু, ইগাসাতান, ওয়া মাগুসাতান, (ومغوثة) যার অর্থ ঃ মদদ করনা (সাহায্য করা)। গাউয়াসার রাজুলু (غوث الرجل) মদদ কেলিয়ে চিল্লানা (সাহায্যের জন্য চিৎকার দেওয়া)। ইস্তাগাসার রাজুলু ওয়াবিহি (استغاث الرجل وبه) মদদ চাহনা (সাহায্য চাওয়া)। আল্‌ গাউসু, ওয়াল্‌ গুয়াসু, ওয়াল্‌ গাওয়াসু, (الغوث والغياث والغويث) মদদ্‌ (সাহায্য)। আল্‌ গাউসু ওয়াল গিয়াসু ওয়াল গাবীসু, খোরাক ওয়াগাইরাকি মদদ্‌ (খাদ্য দ্রব্য জাতীয় ইত্যাদির সাহায্য) আলমুনজেদ-দারুল ইশাআত্‌ করাচী (১) হতে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

অতএব এই মোবারক শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে ব্যবহারিক বাস্তবতা হুবহু গাউসুল আ'যম জিলানী (রাদ্বি.) ও হুজুর গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর গাউসুল আ'যমিয়ত এর সাথে সম্পর্ক আছে বিধায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বিপদের সময় তাঁদেরকে উচ্চ আওয়াজে স্মরণ করলে উভয় গাউসুল আ'যম তাঁদের ভক্ত কূলকে বেলায়তী প্রভাবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের শর্ত ছাড়া সাহায্য করে থাকেন।

মাশ্‌রেক্বী শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ "শরক্ব" (شرق) আরবী শব্দ, পুংলিঙ্গ। "মাশরিক্ব" (مشرق) পূরব (পূর্ব)। ওয়ে জিহ্‌ত জেদ্‌হেরসে সুরজ নিকলতা হে (ঐদিক যেইদিক হতে সূর্য বের হয়)। "শরক হে গরব তক্ব"। মাশ্‌রিক্বসে মাগরিবতক্‌, পূরব্‌ হে পশ্চিম তক্‌ পুরী দুনিয়া (পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী)। "শারক্বী" (شرقى) ফার্সি শব্দ ছিফ্‌ত বা বিশেষণ। যার অর্থ মাশ্‌রিক হে নিসবত রাখনে ওয়ালা, মাশরিক্ব কা (যার পূর্বাঞ্চলের সাথে সম্পর্ক আছে)। (১) "শারক্বী উলুম" (شرقى علوم) ওয়ে উলুম জু এশিয়াছে নিকলে হেঁ (ঐ জ্ঞান সমূহ যা এশিয়া হতে উৎপত্তি বা বের হয়েছে। (২) ওয়ে উলুম জু মাশ্‌রেক্বী জুবানউ মে পড়হা জায়ে, (ঐ জ্ঞান সমূহ যা পূর্ব এশিয়ার ভাষায় পাঠ করা হয় (ফিরুজুল্লুগাত- ৮৪০

পৃষ্ঠা)।

একই ভাবে 'আল্‌মুনজেদ' নামক অভিধানের- ৫২৩ পৃষ্ঠায় আছে, শারাক্বাস্‌ সাম্‌সু (شرق الشمس) অর্থ ঃ সুরজকা নিকাল্‌না (সূর্য বের হওয়া)। আল্‌মাশরিক্ব, ওয়াল্‌মাশ্‌রাকু, ওয়াল্‌ মাশ্‌রুকু (المشرِق والمشرَق والمشرُق) সুরজ কি তুলু হোনে কি জাগা ইয়া ছিম্‌ত (সূর্য উদয় হওয়ার স্থান বা দিক)। জমা' মাশ্যারেক্ব (مشارق) যার বহু বচন মাশ্যারেক্ব।

ইমাম শেরে বাংলা (রহ)'র বাস্তব অর্থ ঃ সুধি পাঠকমন্ডলী এখন আমাদের কাছে 'মাশ্‌রেক্বী' শব্দের অর্থও অভিধান মতে পরিষ্কার হয়ে গেল। অতএব এর ব্যবহারিক অর্থ ও হুযুর গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর ব্যাপারে আমাদের নিতে হবে যেভাবে ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) মুফতীয়ে আ'যম ফরহাদাবাদী (ক.ছি.আ.) অছিয়ে গাউসুল আ'যম, (কঃ ছিঃ আঃ) আল্লামা মুফতি কাঞ্চনপুরী (রহ.)সহ অসংখ্য গবেষক, লিখক ও পীর মাশায়েখগণ নিয়েছেন সে ভাবে। অন্যথায় বিপরীত অর্থ নিলে বিষধর সর্পতুল্য হিসাবে ঈমান ও আমলকে দংশন করবে। যথা ঃ ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) বলেন–

(قطب شرقی مشهور عالم بود و پر فیض شد اطراف عالم) উচ্চারণ ঃ "ব-কুত্ববে মাশ্‌রেক্বী মাশহুরে আ'লম, আযু পুর ফায়জে শুদ আত্বরাফে আ'লম" এই শ্লোকে সম্মানিত লিখক দু'বারই আ'লম (عالم) শব্দ ব্যবহার করছেন, যার অর্থ '**বিশ্ব**'। শেষ অর্ধেকে আ'লম শব্দের সাথে আত্বরাফ (اطراف) শব্দ যোগ করছেন। ইহা "ত্বরফ" (যার অর্থ দিক) শব্দের বহু বচন, যার অর্থ দাঁড়ায় সমগ্র দিক। এতে প্রশ্ন জন্মে কিসের সমগ্র দিক? এর উত্তরে মহান লিখক নিজেই বলছেন, "আলম" অর্থাৎ বিশ্বের। অতএব "আত্বরাফে আ'লম" এর অর্থ হয় বিশ্বের সমগ্র দিক। এখন প্রশ্ন হল বিশ্বের সমস্ত দিকের সাথে তাঁর (হুজুর গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর কী সম্পর্ক? এর উত্তরে ইমামে আহলে সুন্নাত, মোজাদ্দেদে দ্বিনো মিল্লাত (রহ.) বলেন– "ফায়জেশুদ" ফায়জ (কল্যাণ, দয়া) প্রাপ্ত হচ্ছেন। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়। নাক্বেছ (কম.সাময়িক) ফায়জ, না "পুর ফায়জ? (পূর্ণ ফয়েজ বা ফয়জে ইত্তেহাদী) এর উত্তরে তিনি বলেন– "পুর ফায়জ" অর্থাৎ পুরাপুরী কামেলে মোকাম্মেল ফায়জ। যার এক শুভ দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনের ভাষায় " হায়াতে ত্বাইয়িবা" প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের কুত্ববিয়ত, আবদালিয়ত ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করা যায়। উক্ত শ্লোকে আরও আছে মাশহুর (যার অর্থ খ্যাত) এখনো প্রশ্ন সৃষ্টি হয় এই খ্যাতি শুধু কি বাংলাদেশ সহ নিকটতম দেশ সমূহে? এর উত্তরও সম্মানিত মুনকেরদের জন্য তিনি দিয়ে দিলেন অর্থাৎ '**মাশহুরে আ'লম**' (مشهور عالم) যার অর্থ হুজুর গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর এই খ্যাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য। এর পরও প্রশ্ন হয় এই মহান বেলায়তের উজমার অধিকারী কুত্বুল আকত্বাব (যিনি কুত্ববদের কুত্বব বা গাউসুল আ'যম) এর জাগতিক উদয় স্থল, শুভাগমন বা জন্ম স্থান পবিত্র কা'বার কোন দিকে? মাগরিবিতে (পশ্চিমে), জনুবে (দক্ষিণে), শিমালে (উত্তরে), না মাশরেক্বীতে (পূর্বে)? এর উত্তরে তিনি বলেন "**মাশরেক্বী**" অর্থাৎ আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের দয়া ও করুণা পাওয়ার কেন্দ্র পবিত্র কা'বার মুল মুবারক দরজা, পবিত্র জমজমকূপ, পবিত্র মক্বামে ইব্রাহীম, পবিত্র হাজরে আছওয়াদ যেভাবে মুল কা'বা শরীফের পূর্বে অবস্থিত এবং বেলায়তের সম্রাট ইমামুল আউলিয়া মাওলা আলী (রাদ্বি.)'র পবিত্র মাজার শরীফ, হুজুর গাউসুল আ'যম জিলানী (রাদ্বি.), হুজুর ইমামে আযম আবুহানিফা (রহ.) হুজুর খাজা গরিবে নাওয়াজ (রহ.) হুজুর মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) সহ অসংখ্য পীর মাশায়েখদের জন্ম স্থান বা বেলায়তের উদয়স্থল যেভাবে কা'বা শরীফের পূর্বে একই ভাবে ইমামুত্ত ত্বরীকৃত হুজুর গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর উদয় স্থান ও মক্কা শরীফে পূর্বাঞ্চলে। এই শ্লোকের প্রথম শব্দ ব-কুত্বব (بقطب) এতে 'বা' একটি অক্ষর আর কুত্বব একটি শব্দ উভয় মিলে যুক্ত শব্দ হলো 'ব-কুত্বব' বা-এর অর্থ হল মধ্যে, কুত্বব (লস্কর/সৈন্য) ইহা বেলায়তের একটি পদবী এখানে অনেকেই হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কুত্বুল আকত্বাব (গাউসুল আ'যম) এর পদবীকে ইনকার করে শুধু মাত্র নির্দিষ্ট শহর ও পূর্বাঞ্চলের কুত্বব হিসাবে বলতে চায়। কারণ তিনি (ইমাম শেরে বাংলা) কুত্বব বলেছেন। এর উত্তর ত্বরীকৃত পন্থিদের উদ্দেশ্যে প্রশংসা পত্রের শুরুতেই তিনি বলে দিয়েছেন। যথা '**দর মদহে কুত্ববে আ'লম গাউসুল আ'যম**'। (در مدح قطب عالم غوث الاعظم) অর্থাৎ সমগ্র জগতের কুত্বব গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর প্রশংসায় আমি শেরে বাংলা এই শ্লোকগুলি বলছি।

বিষধর সর্পতুল্য জ্ঞানী হতে হুশিয়ার! ঃ এ শ্লোকের অর্থ করতে গিয়ে অনেকেই ব্রেকেটের ভিতরে নির্দিষ্ট পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহের বা পূর্ব অঞ্চলের জন্য ইত্যাদি ভুল অর্থ করেন ও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যার উপর তারা তাছাউফের দৃষ্টিতে কিছু ত্রুটি পূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) এর দোহাই দিয়ে বার বার মাইজভাণ্ডার শরীফের শরাফতের ইতিহাসকে বিকৃত করার পথকে বেছে নিয়েছেন। যথা সম্ভব সম্মানিত কর্মকর্তাগণ মহামান্য আউলাদে গাউসুল আ'যমের অগোচরে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের মুল গ্রন্থের ভিতরে ও বর্তমান (২০০৫ সালে) ছাপানোর সময় পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং তাঁদের নিজস্ব মতের প্রবন্ধকে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য হিসাবে চালিয়ে দিচ্ছেন। (না উজুবিল্লাহ)।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় যে নির্দিষ্টকরণের জন্য ফার্সি ভাষায় ব্যবহার হয় 'রা' (را) বা 'বরায়ে' (برائے) যার অর্থ জন্য। অতীব সম্মানিত লিখক হযরত ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) যে তিনটি শ্লোকের মধ্যে **'মাশরেক্বী'** (مشرقی) শব্দ ব্যবহার করছেন কোন একটিতেও পূর্বাপর **'রা'** বা **'বরায়ে'** উল্লেখ করেন নি সেহেতু এই তিনটি শ্লোকের অর্থের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের বা পূর্বাঞ্চলের জন্য এ বিকৃত অর্থ কোন মতেই করতে পারে না। তবুও এটাকে বিকৃত করে চালিয়ে দেয়ার কারণ হলো প্রথমতঃ ফার্সি ভাষাকে বিকৃত করা, দ্বিতীয়তঃ হুজুর ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) এর জাহের বাতেন জ্ঞানের উপর নিজকে প্রাধান্য দেয়া। তৃতীয়তঃ ফার্সি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, চতুর্থতঃ হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুন্নি আক্বিদা মতে এখনো **স্বশরীরে জীবিত** ও দাতা এ কথাকে অস্বীকার করা অর্থাৎ হুজুর গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর গাউসুল আ'যমিয়তের (বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্বের) তাজ এর দাতা হলেন জীবিত নবী রহমাতুললিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাসাওউফের দৃষ্টিতে গাউসুল আ'যমিয়তের ক্ষমতা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য নয়। আল্লামা জালালুদ্দীন রুমি (রহ.) এর দৃষ্টিতে কারো কারো জ্ঞান নিজেদের ও তাদের অনুকরণ কারীদের জন্য বিষধর সর্প হয়। যা দ্বারা তাদের ঈমান ও আমলকে দংশন করে মৃত্যু বরণ করায়। যথা তিনি বলেন,

(علم را بر دل زنی یارے شود علم را بر تن زنی مارے شود) উচ্চারণ : ইল্‌মে পর দিলজনি ইয়ারে শাওয়াদ+ ইল্‌মে পর তন্‌ জনি মারে শাওয়াদ্। ভাবার্থঃ জ্ঞান যদি অন্তরের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন তা সেই জ্ঞানী ও তার অনুসারীদের জন্য উভয় জগতের বন্ধু হিসাবে কাজ করবে। অন্যথায় যদি বাহ্যিক শরীরের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন তা বিষধর সর্প হিসাবে কাজ করে সকলের ঈমান ও আমলকে মৃত্যু বরণ করাবে। তাই সবাইকে হুঁশিয়ার হতে হবে আল্লাহ্ পাক যাতে সকলকে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) ও ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) এবং যার যার পীর মুর্শিদের উছিলায় বিষধর সর্পতুল্য জ্ঞানী হতে ঈমান ও আমলকে হেফাজত করে। আমিন.....।

বেলায়তের সর্ব উচ্চপদবীর নাম গাউসুল আ'যম ঃ

তাছাউফের পরিভাষায় ওলী আল্লাহদের পদ ও সংখ্যা বহু, তা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উক্ত বহুবচন শব্দের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়। যাঁরা বাতেনী ভাবে প্রতি যুগে আল্লাহর জগতের প্রশাসক হন। এ ব্যাপারে কেউ বলছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কেউ বলেছেন ৩৫৬ জন। বিস্তারিত জানার জন্য **ফুতুহাতে মক্কিয়া, মিরআতুল আছরার, জামেয়ে করামতে আউলিয়া, আয়না-এ-বারী কী তার জুমাতি গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী, নুফহাতুল উনুছ, লতায়েফে আশরাফী,** কাশফুল মাহজুব, আ-ওয়ারিফুল মা-আরেফ, তারিখে ফিরিশতা ইত্যাদি তসাওউফের অমূল্য গ্রন্থাদি দেখার জন্য স-বিনয় অনুরোধ রইল। তবে একথা সত্য যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা মতে অসংখ্য অলী আল্লাহ, যাঁদের রুহানী তাছারুফাতে জগত নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁদের সর্ব উচ্চ পদবীর দায়িত্বে যিনি হন, তাঁকে তাছাউফের দৃষ্টিতে ভারতীয় উপমহাদেশে গাউসুল আ'যম (বিশ্ব ত্রাণ কর্তা) বলা হয়, শুধু মাত্র মাশরেক্বী বা পূর্বাঞ্চলের জন্য নয় । যথা সম্ভব এ কথা ভারত বর্ষে ছৈয়দুনা শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলবী (রহ.) (৯৫৮ হিঃ-১০৫২ হিঃ) এবং আরব বিশ্বে হযরত শেখ যাকারিয়া (রহ.)'র উদ্ধৃতি দিয়ে বিশ্ব-বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলছেন (আখবারুল আখইয়ার ও মিরকাতুল মফাতিহ দ্রঃ)। কেননা ইমামুত ত্বরীক্বত গাউসুল আ'যম জিলানী (রাদ্বি.)'র প্রাথমিক পর্যায়ের জীবনী **"বাহ্‌যাতুল আছরার"** ও **"ক্বালায়েদুল জাওয়াহেরের"** মধ্যে এই (গাউসুল আ'যম) শব্দ নেই। অন্যান্য অসংখ্য অলীগণ গাউসুল আ'যমের অনুগত। তাঁদেরই নির্দেশে অন্যান্য অলিগণ পৃথিবীর এক এক জায়গায় ও শহরে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। যেমন চট্টগ্রাম শহরকুতুব হযরত নজির আহমদ শাহ্ আল মাইজভাণ্ডারী (রহ.) ও হযরত আমির আলী শাহ্ আল্-মাইজভাণ্ডারী (রহ.) সহ অনেক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) এর নিয়োগ প্রাপ্ত কুতুব। গাউসুল আ'যমের নিম্ন পদবীর অলীদের ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন তাঁদের ইমাম গাউসুল আ'যমের অনুমতি ক্রমে নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য হলেও কিন্তু গাউসুল আ'যমের কর্ম ক্ষমতা বা বেলায়তি প্রভাব পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য নয় বরং বিশ্বব্যাপী।

মক্বামে গাউসে আ'যমিয়ত ঃ তাছাউফ জগতে গাউসুল আ'যমের মক্বাম বা পদবীর ব্যাপারে কশফ সম্পন্ন অলী আল্লাহদের মত এবং বিজ্ঞ ত্বরীক্বত এর গবেষকদের দৃষ্টিতে বিল্‌ইত্তেফাক হিসাবে যাঁদের গাউসুল আ'যমের পদবীর ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই অর্থাৎ আলেম, ওলামা, মুফতী, মুহাদ্দেস, পীর মাশায়েখ, দরবেশ, সুফি, কুতুব, আবদাল সবাই এজ্‌মা বা একমত, তাঁদের মধ্যে ইমামুত ত্বরীক্বত হুযুর গাউসুল আ'যম মুহীউদ্দীন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বি.) ও ইমামুত ত্বরীক্বত হুযুর গাউসুল আ'যম মাওলানা শাহ্‌সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ আল্-মাইজভাণ্ডারী (রাদ্বি.) বিশ্ব ব্যাপী প্রচারিত (বেলায়তে মুত্বলাকা, আয়না-এ-বারী, তোহফাতুল আখ্‌ইয়ার, তাওজিহাতুল বহিয়্যাহ)। তবুও মাঝে মধ্যে তাঁদের শান ও মর্যাদার বিপরীত মন্তব্য লিখনী ও আলোচনা আকারে আমরা দেখতে ও শুনতে পাই। যা তাছাউফের নিরিখে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য।

'জাকাত বোর্ডকে' কার্যকর করে গরিবের দিন বদলের উদ্যোগ নিন

● আ ব ম খোরশিদ আলম খান ●

মাহে রমজান আদতেই যে খোদায়ী করুণাধারায় সিক্ত হওয়ার মাস তা আঁচ করা যায় নিরন্ন দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মুখে হাসির ঝিলিক দেখে। দেশের ৬০/৭০ ভাগ গরিব মানুষ বছরের এগার মাস কাটায় দুঃসহ টানাপড়েনে ও অভাব যন্ত্রণায়। এই একটি মাস তাদের অভাব-দুঃখ-হতাশা ও মলিনতা কেন এবং কীভাবে দূর হয়ে খুশির ঢেউ উথলে ওঠে তাদের চোখে মুখে, একটু ভেবে দেখুন। রোজার মাসে গরিবের সচ্ছলতা ও সুন্দর জীবনযাপনের মূলেই রয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র গরিববান্ধব-গরিব দরদী নানা ঐশী বিধান। বুভুক্ষু অসহায় মানুষের দুমুঠো খেয়ে-পরে শান্তিতে দিন কাটানোর সুযোগ ঘটে মাহে রমজানে। এর কারণ একটাই– জাকাত-ফিতরা আদায়ে ধনীদের প্রতি খোদায়ী নির্দেশনা বাস্তবায়নে কম বেশি সবার ঐকান্তিক প্রয়াস। আল্লাহ্‌র বান্দারা স্বাভাবিক স্বস্তিময় জীবন যাপন করবে, একে অপরের সুখে-দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়বে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে পরস্পরের পাশে দাঁড়াবে, ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির প্রচেষ্টায় সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ থাকবে– এই হলো মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাঁর বান্দাহদের ঘিরে। এ জন্যই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে বাধ্যতামূলকভাবে রাখা হয়েছে জাকাত-ফিতরা-দান-সাদকাহ্‌র মতো ইত্যাদি ভারসাম্যমূলক কার্যব্যবস্থা। সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়ে উঁচু-নিচু সবাইকে ঘিরে ধন-সম্পদের আবর্তনে জাকাত-ফিতরা একটি বুনিয়াদি অর্থনৈতিক দর্শন। মানুষ যতোই ধনী হোক, উপর থেকে উপরে উঠুক– তাকেও চারপাশের মানুষের কথা ভাবতে হবে। কেউ গরিব-অসচ্ছল থাকলে তাকে সচ্ছল বানানোর দায়িত্বও ধনীদের কাঁধে বর্তায় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। এজন্য আল্লাহ্ পাক বলছেন– ওয়াফি আমওয়ালিহিম হক্কুল লিস্‌সায়িলি ওয়াল মাহরুম– 'তোমাদের ধনীদের সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব লোকদের অধিকার।' এই অধিকার ফিরিয়ে দেয়া বা দায়িত্ব পালনের অংশই হলো জাকাত ফিতরার ঐশী বিধান। ধনীরা লাখ লাখ টাকা এই ঈদে খরচ করে পরিবার পরিজনের জন্য। নামীদামি পোশাক-কেনাকাটায় ও উন্নত খানাপিনার আয়োজনে ধনীরা থাকেন সদা ব্যস্ত। অথচ তাঁর চারপাশের অভাবী, ক্ষুধায় কাতর, উদোম গায়ে গরিব মানুষের মিছিল দেখে আসছেন তিনি সকাল-সন্ধ্যা। ওই দীন-দরিদ্র মলিন মুখগুলো দেখতে দেখতে তিনি হয়তো পেরেশান। নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে দিন কাটানোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধনীরা এখানে অক্ষম। রাস্তায় নামলে, রাস্তায় হাঁটলে গরিব অসহায় ভিক্ষুকেরা আপনাকে ঘিরে ধরবেই। ট্রাফিক সিগন্যালে আপনি আটকে গেলেন। তখনই ভিক্ষুকের দল এসে আপনাকে অস্থির করে তুলবে, অস্বস্তিতে রাখবে অনেকক্ষণ ধরে। কেন এ অবস্থা দেশের? গরিব মানুষের দিন বদল হয় না। ফলে ওদের যন্ত্রণা ও অভাবতাড়িত জীবন দেখেই যেতে হচ্ছে সবাইকে। অথচ এই জায়গায় সবার অক্ষমতা ও অমনোযোগ লক্ষ্যণীয়।

অভাবী দুস্থ গরিবদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার এবং এদের উপদ্রব থেকে বাঁচবার কোনো উপায় কী খোলা আছে? আছে অবশ্যই। কিন্তু সেদিকে গভীরভাবে দৃষ্টি ফেরানোর চিন্তা-মানসিকতা কয়জনের আছে? কি সরকার বা বিত্তবান কারো মাঝেই নেই গরিবের জন্য মাথাব্যথা। এই বেখেয়াল, দায়িত্বজ্ঞানহীন, হিসেবি ও আত্মসর্বস্ব জীবনদৃষ্টিই দিন দিন আমাদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলছে। সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যদিন। সমস্যা ধীর স্থিরচিত্তে মোকাবেলার পরিবর্তে পাশ কাটানো, এড়িয়ে যাওয়াতেই আমরা অভ্যস্ত। ফলে যা হওয়ার, যা ঘটার তাই ঘটছে আমাদের চারপাশে। গরিবের ঘরের অশান্তির ঢেউ আছড়ে পড়ছে ধনীর দুয়ারে দুয়ারে। গরিবেরা ভালো নেই বলেই শান-শওকত, হাসি-আহ্লাদ ধন সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ধনীরা শান্তিতে-স্বস্তিতে থাকতে পারেন না। এদের হাহুতাশ জীবন যন্ত্রণা না চাইতেও ধনীকে দেখতে হচ্ছে, দুঃখজনক পরিস্থিতি সইতে হচ্ছে। এর থেকে নিস্কৃতি তাহলে কীভাবে?

চারপাশের অভাবী অসহায় গরিব-দুখী মানুষগুলোর জীবন বিপন্ন হলে আপনিও শান্তিতে থাকতে পারবেন না। এদের অশান্ত অবস্থা ও জীবন যন্ত্রণার ভার কিছুটা আপনাকেও সয়ে যেতে হবে পারিপার্শ্বিকতার কারণে। তাই গরিব অসহায় মানুষগুলোকে সচ্ছল করে দেয়ার দায়িত্ব আপনি বিত্তবানকেই নিতে হবে। আপনার স্বস্তির জন্যই তাকে স্বস্তিতে রাখতে হবে। দেশ ও সমাজে সবাইকে হাসিখুশিতে রাখতে পারাই কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বছর বছর ধরে অভাবী, ভূমিহীন, নদী ভাঙনে

ভিটেমাটিহারা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এই লাখ লাখ দুঃখপীড়িত মানুষকে কীভাবে পুনর্বাসন করা যায় ও এদের সচ্ছল জীবনধারার সন্ধান দেয়া যায় তাই ভাবতে হবে গুরুত্বের সাথে। গরিব, অভাবী দুস্থ মানুষের জীবন বদলে দেয়ার জন্য ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচি জাকাতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে সরকার ও বিত্তবানদের। সরকারের এনবিআর কর্তৃপক্ষ যেভাবে লাখ লাখ করদাতার কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ও বিধিবদ্ধভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা নেয়– একই ভূমিকা থাকা উচিত জাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনে। যেহেতু জাকাত ঐচ্ছিক বিষয় নয়, সচ্ছল, সক্ষম ধনীদের ওপর ফরজ কর্তব্য। ইসলামী বিধান মতে, রাষ্ট্র তাঁর অধীন ধনী সচ্ছল লোকদের থেকে বাধ্যতামূলকভাবে জাকাত আদায় করবে। কেউ যদি সঙ্গত কারণ ছাড়া জাকাত প্রদানে গড়িমসি বা অস্বীকার করে তাকে জনস্বার্থে জাকাত দিতে বাধ্য করাই ইসলামী নির্দেশনা। এজন্যে আইনি ব্যবস্থা ও বিধিবদ্ধ রূপরেখা তৈরি ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে ইসলাম। অথচ মুসলিমপ্রধান এই বাংলাদেশে জাকাতের ব্যাপারে গণবান্ধব এই ইসলামী নির্দেশনা বরাবরই উপেক্ষিত হয়ে আসছে। জাকাত সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ ও বণ্টনে রাষ্ট্রীয় জোরালো ভূমিকা অনুপস্থিত। সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে বহু পদক্ষেপ নেয়। শত শত কোটি টাকার বাজেট থাকে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে। কিন্তু জাকাতের মতো বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিকটি কোনো সরকারের আমলে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। এমনকি যারা ইসলামী আদর্শ ও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি বিশেষ সজাগ বলে দাবি করে থাকে তারাই ঘুরে ফিরে ত্রিশ বছর ধরে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে থাকলেও দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে কোনো পাত্তাই দেয় নি। নিজেদের স্বার্থে, দলীয় ও পরিবারের স্বার্থের দিকে চেয়ে বহু অর্থনৈতিক প্রকল্প বিগত সরকারগুলো বাস্তবায়ন করেছে অথচ গরিবের স্বার্থে জাকাতভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনে বড় কোনো প্রকল্প ও পদক্ষেপ নিতে তারা ইচ্ছাকৃত উদাসীন ছিল বলেই অনুমিত হয়। ফলে দরিদ্রের হার বেড়েই চলেছে দিনে দিনে। লাখ লাখ ধনীদের কাছ থেকে কর আদায় করে দেশের অর্থনীতি সচল রাখা হয়েছে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়া হচ্ছে এটা যেমন প্রত্যাশিত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ– ঠিক একইভাবে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ও গরিবের ভাগ্য বদলে দিতে জাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে। ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন সরকারের একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠান 'জাকাত বোর্ড' আমরা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি। এই জাকাত বোর্ডের কী কাজ? দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাত বোর্ডের কী ভূমিকা আছে? এই জিজ্ঞাসা সচেতন দেশবাসীর। দেশবাসীর আজ প্রত্যাশা ও দাবি–

এনবিআর যেভাবে ধনীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক কর আদায়ের ব্যবস্থা করে থাকে তেমন উদ্যোগ জাকাত বোর্ডকেও নিতে হবে। জাকাত প্রদানে সক্ষম ধনীদের ওপর জরিপ চালিয়ে জাকাত প্রদানে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতে হবে জাকাত বোর্ডকে। যদি বিদ্যমান জাকাত বোর্ডের এই দায়িত্ব পালনে কোনো সীমাবদ্ধতা ও আইনি বাধা থাকে তা দূর করতে হবে। প্রয়োজনে অকার্যকর নিষ্ক্রিয় জাকাত বোর্ড বিলুপ্ত করে স্বতন্ত্র ' জাকাত পরিদপ্তর' গঠন করা যায় কি-না গণতান্ত্রিক সরকারকে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। প্রস্তাবিত 'জাকাত পরিদপ্তর' সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে জাকাত সংগ্রহ ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টনে ভূমিকা রাখতে পারে। এভাবে অগ্রসর হয়ে গরিব, দুস্থ, অভাবী, ভূমিহীন, নদী ভাঙনে ভিটেমাটি হারা মানুষগুলোকে জাকাতের টাকায় স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন, স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেয়া জরুরি। এজন্যে জাকাত বোর্ডকে পুনর্গঠন শক্তিশালী ও কার্যকর করার কথা ভাবতে হবে।

মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার, তাকে তুলে আনার ও শান্তিতে রাখার চেষ্টা ও সৎ উদ্যোগ ব্যক্তি পর্যায়ে শুরু হলে একদিন তা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। এই রোজায়-ঈদ মৌসুমে আপনি চারপাশের গরিব লোকগুলোকে খুঁজে খুঁজে তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করুন। পরিকল্পিত উপায়ে তাদের স্বাবলম্বী সচ্ছল করে তুলতে উদ্যোগটা প্রথমে আপনি শুরু করুন। জাকাত-ফিতরার টাকা দিয়ে গরিব লোকদের মুখে চিরস্থায়ী হাসি ফুটানোর উদ্যোগ নিয়ে একটি মহৎ কাজের গর্বিত অংশীদার হোন। কোনো অভাবগ্রস্ত সাহায্য প্রার্থীর মুখের ওপর 'না' বলবেন না। আলাহ্ পাক বলছেন, ওয়া আম্মাসসায়িলা ফালা তানহার- 'তোমরা প্রার্থীকে 'না' বলে তাড়িয়ে দিও না।' [সূরা দোহাঃ পারা ৩০]। গরিবদের জন্য হ্যাঁ বলুন– এবারের মাহে রমজানে এই হোক আমাদের প্রত্যয় ও দৃপ্ত অঙ্গীকার। মাহে রমজানে জাকাত ফিতরার উদ্দেশ্য মূলত এটাই এবং সিয়াম দর্শন এই আহ্বান জানায় মানবতার কাছে।

চট্টল বিজেতা সূফী কদল খান গাজী আলাইহির রাহমাহ্

● মুহাম্মদ রবিউল আলম ●

বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার মাধ্যমেই ইসলামের অনুকূলে সর্বপ্রথম বিজিত হয়। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কদলখান গাজী। তিনি একাদশ মিত্রের সাহায্যে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। চট্টল বিজেতা কদল খান গাজী সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনী চট্টগ্রাম বিজয় ও চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের মধ্যে সীমিত। চট্টগ্রাম বিজয় ও ইসলাম প্রচারে এত ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ততোটুকু পরিচিতি নেই। তাই চট্টগ্রাম বিজয় ও চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা নিম্নে আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি। আরবীয় ভৌগলিকদের সাক্ষ্য-বিবরণীর তথ্য মতে, খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামের সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তখন থেকে চট্টগ্রাম মুসলিম সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিক ওহীদুল আলম বলেন, "খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে ইসলামী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরব নাবিক ও বণিকগণ সীমাহীন সমুদ্র পাড়ি দেন এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে অবতরণ করেন। প্রথম ধাক্কায় সিন্ধু প্রদেশের পতন ঘটে এবং সেই সময়ে আরবগণ পূর্বদিকে পাড়ি জমায়। এভাবে তাঁরা চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে। তবে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের (১২০৪-৬খৃঃ) ১৩৫-৬ বছর পর। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ফখর উদ্দিন মোবারক শাহের রাজত্বকালে সেনাপতি কদলখান গাজী আরাকানীদের বিতাড়িত করে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার আরম্ভ হয়। চট্টগ্রাম বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক দরবেশ হযরত বদর শাহ (রাঃ) তাঁকে সহযোগিতা প্রদান করেন। চট্টগ্রাম বিজয়ের সমসাময়িক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খাঁ তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে মক্তুল হোসেন গ্রন্থের ভূমিকাংশে নিজের অলক্ষে মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়ের কাহিনী এবং বিশেষ করে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কদলখান গাজী যে বীর পুরুষ ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি ফখর উদ্দিন মোবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন। কবি মোহাম্মদ খাঁ বলেছেন যে- কদলখান গাজী পীর একাদশ মিত্রের সাহায্যে অসংখ্য রিপুদল পরাজিত করে চট্টগ্রামে এক আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করেন তথা ইসলাম প্রচার করেন। ড. এনামুল হক তাঁর 'বাংলাদেশে সূফিবাদের ইতিহাস' গ্রন্থে ১৬৪৬ সালে রচিত বাংলা পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে-

"কায় এ মনে প্রণাম করি বারে বার
কদলখান গজী জান ভুবনের সার ॥
যাঁর রণে পড়িল অসংখ্য রিপুদল
ভএ কেহ মজিলেক সমুদ্র গহন ॥
একপার হইল সহস্র প্রাণহীন
রিপুজিনি চাটি গ্রাম কৈলা নিজাধীন ॥
বৃক্ষডালে বসিলেক কাফিরদের গণ
সেই বৃক্ষ ছেদ করে করিল নিধন ॥
তাঁর এক মিত্রে বসিলেক চাটস্বরী
মুসলমান কৈলসব চাটিগ্রাম পুরী ॥"

অর্থাৎ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কদলখান গাজীকে আমি সমগ্র হৃদয় দিয়ে মর্যদায় অভিষিক্ত করছি। তাঁর সাথে যুদ্ধে অসংখ্য শত্রু ধরাশায়ী হল। তাদের কেউ কেউ সমুদ্রে ডুবে মরল। এক জনের নির্দেশে হাজার হাজার জন নিহত হলো। শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করে তিনি চট্টগ্রামকে নিজের অধীন করলেন। গাছের ডালে ওঁতপেতে বসে থাকা কাফির শত্রুসেনাদেরকে গাছসহ ধ্বংস করলেন এবং তাঁর জনৈক সাথী চাটেশ্বরী দখল করলেন। অতঃপর চট্টগ্রাম অধিবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। মক্তুল হোসেন গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, যুদ্ধ শেষে কদলখান গাজী যখন শিবিরে ফিরছিলেন তখন নিজের কয়েকজন বন্ধু-দরবেশদেরকে দেখলেন। তাঁদের মধ্যে হাজী খলিল ও বখতিয়ার মাহী সওয়ার ছিলেন সুবিখ্যাত। কদলখান গাজী তাঁদেরকে শিবিরে নিয়ে গেলেন এবং হাজী খলীলকে দেখে বদরে আলম খুশি হন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, চট্টগ্রাম সর্ব প্রথম বিজিত হয় কদলখান গাজীর হাতে এবং বদর শাহ কদল খানের সমরসঙ্গীদের একজন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে কদলখান গাজী ছিলেন ফখর উদ্দিন মোবারক শাহের সেনাপতি। কিন্তু আসকার ইবনে শাইখ বলেন, " সূফী কদল গাজী ও তাঁর শিষ্যসঙ্গীরা চট্টগ্রাম এসে স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সুলতান ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ তাঁদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন এবং চট্টগ্রাম এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসে।" কতিপয় ঐতিহাসিকদের মতে, কদল খান গাজী

নিজেই তাঁর শিষ্য নিয়ে বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ তাঁকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। এতে বুঝা যায় যে, কদলখান গাজী সুলতান ফখর উদ্দিন শাহের সেনাপতি ছিলেন না। আসকার ইবনে শাইখসহ কতিপয় ঐতিহাসিক যাঁরা উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও আবার তাঁকে সুলতান ফখর উদ্দিন শাহের সেনাপতি লিখেছেন। এমনও হতে পারে যে, কদলখান গাজী করদ্রাহী সুলতান ছিলেন। যেটাই সঠিক হোক না কেন, চট্টগ্রাম যে কদল খান গাজীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম বিজিত হয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই। তিনি শুধু একজন সেনাপতিই ছিলেন না; বরং একজন উঁচু পর্যায়ের অলীও ছিলেন। যে কারণে চট্টগ্রামকে বার আউলিযার পূণ্যভূমি বলা হয়, কদলখান গাজী সেই বার আউলিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ডক্টর আবদুল করিম, আব্দুল হক চৌধুরী,ওহীদুল আলম, আসকার ইবনে শাইখ, আহমদ মমতাজ প্রমুখের মতে, কদল খান গাজী ছিলেন বার আউলিয়ার অন্যতম। বিগত পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের নেতৃত্বে অনুসন্ধান করে চট্টগ্রামের পটিয়া থানা থেকে অলী আবদাল সম্পর্কিত একটি পুরাতন আরবি হস্তলিপি সম্বলিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়। তাতেও বার আউলিয়ার নামের মধ্যে কদলখান গাজীর নাম পাওয়া যায়। সতের শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি মোহাম্মদ খাঁও 'মক্তুল হোসেন' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁকে বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন বলে উল্লেখ করেন। চট্টগ্রাম অভিযানকালে কদলখান গাজী রাউজানের কদলপুর নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করেন। ডক্টর আব্দুল করিম, আব্দুল হক চৌধুরী, ওহীদুল আলম, ডক্টর আহমদ শরিফ, ডক্টর মোঃ আবুল কাশেম, আহমদ মমতাজ, নুরুল হক এম এ, মাহবুবুল আলম প্রমুখ লেখক ও ঐতিহাসিকের মতে, কদলখান গাজীর নামানুসারে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামের নাম করণ করা হয়। কারণ তিনি এ গ্রামে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর নামের স্মারক রূপে স্থাপিত "কদলপুর" গ্রামে কদলের বাড়ি ও কদলের দীঘি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে (২০১২ইং) কদলের বাড়ি ও দীঘি কদলপুর গ্রামের বাইরে। কারণ, সেই সময় কদলপুরের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে রাউজান খাল থেকে দক্ষিণে পাহাড়তলী মহামুনি পর্যন্ত। আর এখন (২০১২ইং) হল চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি মহাসড়ক হতে ৪কিঃমিঃ দক্ষিণে এবং চট্টগ্রাম কাপ্তাই মহাসড়ক হতে ২ কিঃমিঃ উত্তরে, উত্তর দক্ষিণ ৫কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য, পূর্ব পশ্চিম ৩ কিঃমিঃ প্রস্থ হাফেজ বজলুর রহমান সড়কের (প্রাচীন আরাকান সড়ক) উভয় পার্শ্বে। রাউজান থানার কদলপুরের সাথে কদলখান গাজীর সম্পৃক্ততার বিষয়ে 'বাংলাদেশ ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার্স, চট্টগ্রাম'এ উল্লেখ আছে-

"When Fukra became the independent Sultan of Sonargaon and assumed the tittle of Fakhruddin Mubarak Shah, he occupied Chittagong... Probably it was during the reign of Arkanee king minhti (1374). Accordng to tradition, Kadal Khan Ghazi (Qadr Khan) was a military officer and contemporary (who came with Mahswar Baktear Siddique) of Fakhruddin, who conquered Chittagong. There is a village named Kadalpur under Raozan Police Station. Maqtul Husain a Bengali Book written in 1654 records that Haji Khalil and Badruddin Allama were engaged in preaching Islam in Chittagong about this time. Kadal Khan Ghazi met Hazi Khalil (a companion of Shah Jalal of sylhet) and Bara Aulia and Allama Badruddin and hononred them".

"ফখরু সোনার গাঁয়ের স্বাধীন সুলতান হয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম ধারণ করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকার করেন। সম্ভবত ইহা ছিল আরকানী রাজা মিনহটির (১৩৭৪) রাজত্ব কাল। প্রচলিত মতে, কদলখান গাজী (কদরখান) ছিলেন চট্টগ্রাম দখলকারী একজন সামরিক অফিসার এবং ফখর উদ্দিনের সমসাময়িক ব্যক্তি (যিনি মাহি সওয়ার বখতিয়ার সিদ্দীকের সাথে ছিলেন)। রাউজান থানাধীন কদলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ১৬৫৪ সালে বাংলা ভাষায় লিখিত 'মক্তুল হোসেন' নামক পুস্তকের লেখা প্রমাণ করে যে, হাজী খলিল এবং বদরুদ্দীন আল্লামা সেই সময় চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। কদলখান গাজী হাজী খলিল (সিলেটের শাহ জালালের অন্যতম সঙ্গী), বার আউলিয়া ও আল্লামা বদরুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেন।" কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি 'কদলপুর' নামক এলাকা জায়গীর হিসাবে পেয়েছেন। উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, চট্টল বিজেতা সেনাপতি ও বার আউলিয়ার অগ্রজ সূফি কদল খান গাজী (রহঃ) এর নামানুসারে চট্টগ্রামের রাউজান থানার

ঐতিহ্যবাহী গ্রাম কদলপুরের নাম করণ করা হয়েছে। জ্ঞাতব্য যে, চট্টল বিজেতা সেনাপতি সূফি কদলখান গাজী (রহঃ) কদলপুর নামক যে গ্রামের গোড়াপত্তন করেছেন এবং তাসাউফের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন, সে কদলপুর গ্রাম এখনো একটি আধ্যাত্মিক গ্রাম হিসেবে পরিচিত। এখানে জন্ম নিয়েছেন হযরত মোল্লা মিসকিন শাহ (রহঃ) যাঁর সাধনাস্থল কদলপুর গ্রামে এবং মাজার শরীফ চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরায় অবস্থিত। উক্ত কদলপুর গ্রামের একটি আধ্যাত্মিক পাহাড়ে শুয়ে আছেন অত্র এলাকার সুলতানুল আউলিয়া হযরত ছৈয়দ আশরাফ শাহ (রহঃ), হযরত আবু শাহ (রহঃ), হযরত আজিজুল হক শাহ (রহঃ), হযরত হামীদুল হক শাহ (রহঃ) প্রমুখ আধ্যাত্মিক সাধকগণ। এই গ্রামে আরো শুয়ে আছেন বৃটিশ যুগের বিখ্যাত ফার্সী বিশারদ, বিশিষ্ট সূফি - সাধক , আলেমে দীন, শিয়া বিরোধী আন্দোলনের মধ্যমনি মেহের উল্লাহ মুন্সী কদলপুরী (রঃ), তদীয় পুত্র বিশিষ্ট সূফি সাধক ও বৃটিশ আমলের বিখ্যাত ফার্সী বিশারদ হযরত আল্লামা আব্দুল আজিজ কদলপুরী, হযরত মীর চাঁদ শাহ (রহঃ), হযরত মিয়াশাহ (রহঃ) প্রমুখ সূফি-সাধকগণ। এখনো এই গ্রামে অগণিত নর-নারী উপর্যুক্ত সূফিয়ানে কেরামের ফুয়ুজাত হাসিলের লক্ষ্যে কদলপুর গ্রামে সর্বদা ভিড় জমায়। সম্ভাব্য সংশয়ের নিরসনকল্পে আলোচনা করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার্স চট্টগ্রামের বর্ণনা মতে কদল খান গাজীর অপর নাম কদর। উল্লেখ্য যে, কদর খান নামক ফখরুদ্দীনের একজন শত্রু ছিল, তিনি ১৩১৮ সালে ফখরুদ্দীনের সাথে যুদ্ধে নিহত হন। ফখরুদ্দীন গাজী ১৩৪০ সালে চট্টগ্রাম বিজয় করেন, এবং কদল খান ফখরুদ্দীনের সেনাপতি ছিলেন। সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কদলখান গাজীর মাজার কোথায়, এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ডক্টর আবদুল করিম, আবদুল মান্নান তালেব প্রমুখের মতে, কদলখান গাজী এবং কাতাল শাহ একই ব্যক্তি যাঁর মাজার শরীফ চট্টগ্রাম শহরের কাতালগঞ্জে অবস্থিত। আব্দুল হক চৌধুরী বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে উপরিউক্ত মতটি অস্বীকার করেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। অনেক অলী আল্লাহ বা ইসলাম প্রচারকগণ এক স্থানে ইসলাম প্রচার করার পর সেখান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে ইসলাম প্রচারে রত হন অথবা নিজ মাতৃভূমিতে চলে গিয়ে ইসলামের খেদমতে আজীবন নিয়োজিত থাকেন। যেমন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) চট্টগ্রামে ইসলামের প্রচারের মিশন সমাপ্ত করে ইরানের বাস্তাম শহরে চলে যান এবং সেখানে তিনি ওফাত পান আর সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এভাবে বখতিয়ার মাহী সওয়ার (রহঃ) আপন দায়িত্ব শেষ করার পর তাঁর নিজ মাতৃভূমি বাগদাদ পানে চলে যান। হতে পারে কদলখান গাজী (রহঃ)ও উপরিউল্লেখিত ইসলাম প্রচারকদের মত নিজ মাতৃভূমি অথবা অন্য কোন স্থানে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমাদের ধারণা চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জে কাতালপীর খ্যাত সমাধিস্থ ব্যক্তিটি কদলখান গাজী ছাড়া অন্যজন হওয়ার সম্ভবনাই অধিক। কেননা সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় যে নির্দিষ্ট অলী দ্বারা যে শহর বা দেশে ইসলামের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। সেই অলীর মাজার শরীফ সেই এলাকার লোকদের নিকট অতীব প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত স্থান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক যুগে মানুষের কাছে তাঁর প্রসিদ্ধি ও ভক্তি স্থায়ী থাকে। যেমন- সিলেট বিজয়ী হযরত শাহ জালাল (রহঃ), রাজশাহীর শাহ মাখদুম আব্দুল কুদ্দুস রুপোস (রহঃ), বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) প্রমুখ সূফিগণ উল্লেখিত এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন এবং তাঁদের মাজারসমূহ নিজ নিজ এলাকায় প্রসিদ্ধ, যা সব সময় লোকে লোকারণ্য থাকে। কিন্তু কাতাল পীরের মাজার শরীফখানি উপর্যুক্ত মাজার শরীফ সমুহের সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্র প্রবন্ধ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় কদল খান গাজী (রহঃ) একাধারে ইসলামী সেনাপতি, সূফি ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। এবং তিনি ইসলামের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে অন্য কোনদেশে গমন করা অথবা দায়িত্ব শেষে মাতৃভূমির টানে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভবনা অধিক বলে মনে হয়।

মোট কথা কদল খান গাজী ও কাতাল পীর একব্যক্তি হোক অথবা ভিন্ন জন হোক, ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্য মতে কদল খান গাজী (রহঃ)ই হচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিজেতা এবং তাঁর নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

তথ্যসূত্র

১) ড. আবদুল করিম, হযরত শাহ সূফি আমানত খান, প্রকাশনাঃ হযরত আমানত খান (রাঃ) ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম , ৫ম সংস্করণ, মাঘ, ১৪০৯ বাংলা, পৃঃ১২

২) ড. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমাল, ৪র্থ সংস্করণ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনা, ঢাকা, পৃঃ ১৭৩,১৭৪,১৭৮

৩) ড. আবদুল করিম, মোল্লা মিসকিন শাহ (রাহ:), বাইতুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম, জুলাই ১৯৮৭ ইং,পৃ:১১,৩৮

৪) ড. আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম ,ইতিহাস পত্রিকা ,১ম বর্ষ,১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, চবি,পৃ:৩৪-৩৫ ।

৫) প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি , ১ম সংস্করণ মার্চ ২০০৩, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৭ ।

৬) সাহিত্যিক মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানো আমল), নয়ালোক প্রকাশনী , চট্টগ্রাম , ১৯৬৫ ইং,পৃ:৪৭

৭) কবি ওহীদুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল, আলমবাগ প্রকাশনী, কাজীর দেউরী, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৮২ইং, পৃ:-৭,১২,

৮) আব্দুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম আরাকান, প্রকাশকাল: জুন ১৯৮৯, চট্টগ্রাম । পৃঃ ১৩০,২৬৭,৪৭,৪৮,১১৬

৯) আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইসলাম, প্রকাশনা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
পৃ:১০৭,১০৮

১০) আসকার ইবনে শাইখ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৮৮, ৩য় সংস্করণ: আগষ্ট ২০০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ: ২৯,৯৪,১১৩,২৭৭

১১)মাওলানা হামীদুল্লাহ খান বাহাদুর, আহাদীছুল খাওয়ানীন ,মাজহারুল আজায়ীব, কলকাতা,১৮৭১ ইং,পৃ:১৪৩ ,২০৩, ২০৪ ।

১২) ড.আহমদ শরিফ, চট্টগ্রামের ইতিহাস ,পৃ:১৪-৩২)

১৩) দৈনিক আজাদী লিমিটেড সম্পাদিত, হাজার বছরের চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৯৫ইং, পৃ: ৫৯ ।

১৪) আহমদ মমতাজ, চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার ও বার আউলিয়া প্রসঙ্গ, অগ্রপথিক, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০৯ইং, পৃ: ৭২,৭৪

১৫) ডক্টর মো: আবুল কাশেম, রাউজানের ইতিহাস, অন্বয়, প্রকাশকাল: ৮ই মার্চ, ২০০১ইং, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম , পৃষ্ঠা নাম্বার বিহীন ।

১৬) এম. নুরুল হক এম,এম, এ, বৃহত্তর চট্টল, ১ম সংস্করণ: ১৯৭৬ইং, ২য় সংস্করণ ১৯৭৭ইং, হাবিব প্রিন্টিং প্রেস, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, পৃ: ৪৮ ।

১৭) হারুন-উর-রশীদ, গ্রামের নাম কদলপুর, দৈনিক পূর্বকোণ,১৮ই অক্টোবর ২০০৮ইং, কলাম: ৮ম, পৃ: ৬

২৮) সাইয়্যেদ আহমদুল্লাহ , আজিমপুর দায়রা শরীফ,ঢাকা, ১ম সংস্করণ,২০০০ ইং,পৃ: ৪ ।

১৯) সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬),খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা,২০০০ইং,পৃ:১৯৬-১৯৭ ।

২০) এডভোকেট কাজী মুহাম্মদ নাজমুল হক, কদলখান গাজী ও কদল পুরের নামকরণ, অন্বয়, প্রকাশকাল: ৮ই মার্চ, ২০০১ইং, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম ,পৃষ্ঠা নাম্বার বিহীন ।

সূফি উদ্ধৃতি

■ আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তিনটি স্বভাব দান করেন। যথা– (ক) সমুদ্রের মত বদান্যতা, (খ) সূর্যের ন্যায় উদারতা ও (গ) ভূতলের ন্যায় নম্রতা।

■ আল্লাহ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করেন, তার পিছনে এক ফিরআউন লাগিয়ে দেন।

■ সৎ সাহচর্য সৎকার্য থেকে উত্তম আর কুসংসর্গ কুকার্য থেকে মন্দ।

■ হায় কত ভাল হত! যদি মানুষ নিজেকে নিজে চিনতে পারত! নিজেকে নিজে চিনতে পারলে তার পূর্ণ মারিফাত হাসিল হয়।

–হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ)

■ আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তার প্রতি নানারূপ বিপদাপদ আসে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ যাকে শত্রু মনে করেন, সে জগতে বহু সুখ ও শান্তিতে বসবাস করে।

– হযরত ফোজায়েল (রাহঃ)

নবীদের ইতিহাস

ইমাম উদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দামেস্কী (৭০০-৭৭৪ হিজরী)
[মূল আরবী থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ : রাশাদ আহমদ আজমী]
॥ ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ৮৯ কিস্তি)

সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছেঃ (বঙ্গানুবাদ)

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখোনা, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী'।"

"অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহিয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, আমাকে তারা ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" (২১:৮৯-৯০)

মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আম-এ বলেনঃ

"এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, এরা সকলে ছিল সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।" (৬:৮৫)

ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস বইতে হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালাম সম্পর্কে বলেনঃ তিনি হচ্ছেন যাকারিয়া বিন বরখিয়া। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি হচ্ছেন যাকারিয়া বিন ডান।

হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালাম এর সত্যকাহিনী মানুষকে জানানোর জন্য হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম এর প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালামকে একজন সন্তান দান করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন জন্ম-বন্ধ্যা। তিনি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন যাতে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়েন। মহান আল্লাহ বলেন, "এ হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল, নিভৃতে। (১৯:২-৩)

কাতাদাহ বলেনঃ আল্লাহ তাঁর নির্মল হৃদয় ও গোপন প্রার্থনার কথা জানতেন। অন্যরা বলেছেনঃ তিনি রাতে ঘুম হতে ওঠে চুপিসারে আল্লাহকে ডাকতেন যাতে আর কেউ তাঁর প্রার্থনার কথা জানতে না পারে। কোন সন্তান না থাকার কষ্ট ও মনোবেদনা তিনি মহান রবের কাছে মর্মস্পর্শী ভাষায় পেশ করেছেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে আর আমার মাথা হয়েছে শুভ্রোজ্জ্বল।" (১৯: ৪)

"এবং তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি।" (১৯: ৪) আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা সবসময় কবুল করে আসছেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন হযরত ইমরান (আঃ) এর আত্মীয়। হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান (আঃ) এর ছিলেন তিনি অভিভাবক। যখনই তিনি হযরত মারয়াম (আঃ) এর কক্ষে যেতেন তখনই সেখানে প্রচুর ফল ফলাদি মজুত দেখতে পেতেন। যদিও তখন ফলের মৌসুম ছিলনা। তা দেখে তাঁর মনে একটা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জাগে। কেননা যে মহান আল্লাহ ফলের মৌসুম না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন বান্দিনীর জন্য ফলের ব্যবস্থা করেন তিনি নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বয়সে এবং স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সন্তান দান করতে পারেন। "অতঃপর যাকারিয়া তার প্রতিপালকের কাছে নিবেদন করল আমাকে তোমার তরফ হতে সজ্জন উত্তরাধিকারী দান কর, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

"এবং আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে দান কর উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে আর উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাঁকে করো সন্তোষভাজন। (১৯:৫-৬)

আয়াতে 'মাওয়ালী' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে স্বগোত্রীয়। সম্ভবত এর দ্বারা নিকটাত্মীয়দের বুঝিয়েছেন। সম্ভবত তাঁর আনীত শরীয়া ও আল্লাহর ধর্ম সম্পর্কে (তাঁর মৃত্যু) পরবর্তী সময়ে ইসরাইলীদের মনোভাব ও আচরণ সম্বন্ধে তাঁর মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তাঁর জীবদ্দশায় তারা যেভাবে অনুগত আছে, তাঁর মৃত্যুর পর সেরকম অনুগত থাকবে না। তাই যদি তাঁর একজন ধর্ম ও ন্যায়পরায়ন সন্তান থাকে তাহলে সে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারবে। সে ছেলে হতে পারবে তাঁর প্রজ্ঞা ও নবুয়তের উত্তরাধিকারী। তবে এ উত্তরাধিকার সম্পদের উত্তরাধিকার নয়। নবীদের উত্তরাধিকারের অর্থ জ্ঞান বিজ্ঞতা স্বর্গীয় শিক্ষা ও নির্দেশনার উত্তরাধিকার। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়াবলী উল্লেখ করা যায়ঃ

১. আল্লাহ বলেছেনঃ "এবং সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছে।" (২৭ঃ ১৬) এর অর্থ হচ্ছে তিনি নবুয়ত ও প্রজ্ঞার উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে উল্লেখিত বিশুদ্ধ কিছু হাদিস আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যাইনা, যা রেখে যাই তার সবটুকু সদকা।" এটা সুস্পষ্ট যে নবীদের সম্পদের কোন উত্তরাধিকার হয়না। এ কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর রেখে যাওয়া সম্পদ হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর উত্তরাধিকারীদের দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা ছিলেন নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ), উম্মুল মোমেনীনগণ (রাঃ) ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)। হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত হাদিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবা যেমন হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যরা তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেন।

(নোটঃ অবশ্য এ বিষয়ে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন এতে আহলে বায়তকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহই এ বিষয়ে উত্তম জানেন। -অনুবাদক)

২. ইমাম তিরমিজি এ হাদিস আরো সুস্পষ্ট অর্থে বর্ণনা করেছেন "আমরা নবীরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যাইনা।"

৩. নবীদের (আঃ) জন্য এ দুনিয়া কিছুই নয়। তাঁরা সম্পদ আহরণ ও জমা করার কাজে লিপ্ত ছিলেন না। দুনিয়ার সম্পদ তাঁদের কাছে ছিল তুচ্ছ। এ সবের প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ ছিলনা। তাঁদের সন্তানদেরকে সম্পদ জমা করার শিক্ষাও তাঁরা দেননি।

৪. হযরত যাকারিয়া (আঃ) একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। নিজের হাতে কাজ করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর পূর্বে হযরত দাউদ (আঃ)ও স্বীয় পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু জীবিকার কাজে নবীগণ পূর্ণ সময় ধরে নিয়োজিত থাকতেন না। যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ তাদের হস্তগত হতে পারত ও জমাকৃত উদ্বৃত্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টিত হতে পারত।

ইমাম আহমদ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "হযরত যাকারিয়া (আঃ) একজন সূতার ছিলেন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ

"হে যাকারিয়া আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে য়াহুয়া, এ নামে আমি পূর্বে কারো নামকরণ করিনি।" (১৯ঃ৭)

"যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফিরিশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ তোমাকে য়াহুয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন যে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।" (৩ঃ৩৯)

মহান আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত যাকারিয়া (আঃ) কে একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন তখন তিনি যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সন্তান লাভ সাধারণ যুক্তি ও বিশ্বাসে অসম্ভব ছিল। তাই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেনঃ **"হে আমার প্রতিপালক, কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।" (১৯ঃ৮)**

বয়সের ভারে দুর্বল একজন মানুষের বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম নেবে তা বুদ্ধির অগম্য। কেউ কেউ বলেন সে সময় হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর বয়স ৭৭ কিংবা তার চেয়েও বেশি ছিল।

হযরত ইবারাহিম (আঃ)ও পুত্রের সুসংবাদ পেয়ে অনুরূপ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেনঃ

"তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভসংবাদ দিচ্ছ?" (১৫ঃ৫৪)

বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ করার শুভ সংবাদে হযরত সারাহ (আঃ) এর প্রতিক্রিয়াও ছিল অনুরূপঃ

"সে বলল, কী আশ্চর্য! সন্তানের মা হব আমি, যখন আমি হয়ে পড়েছি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও (একজন) বৃদ্ধ (মানুষ)! এটাতো অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার!"

"তারা বলল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।" (১১ঃ৭২-৭৩)

তাই হযরত যাকারিয়া (আঃ) যখন বিস্ময় প্রকাশ করলেন তখন ফিরিশতা বললেনঃ

"এ রূপেই হবে। তোমার প্রভু বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। আমি তো তোমাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।" (১৯ঃ৯) অর্থাৎ আল্লাহ যখন অনস্তিত্ব থেকে যে কোন কিছু ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করতে পারেন কেন তিনি জীবন্ত (মানুষ) থেকে অন্য কিছু (পুত্র সন্তান) সৃষ্টি করতে পারবেন না?

"অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম য়াহুয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে

যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতি সহকারে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" (২১:৯০)

এখানে স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করার অর্থ সন্তানের মা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক সক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া। আল্লাহর পক্ষে তা অতি সহজ।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) এ বিষয়ে আরো কিছু নিদর্শন আল্লাহর কাছ হতে জানতে চাইলেন। যাতে তিনি বুঝতে পারেন সত্যিই তাঁর স্ত্রী গর্ভধারন করেছেন। আল্লাহ তাঁকে বলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি ইশারা ব্যতীত কোন কথা বলতে পারবে না। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, তাঁর কোন শারীরিক অসুবিধা দেখা দেবে কিংবা কোন অঙ্গহানি ঘটবে। বরং এ অবস্থায়ও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন। তাঁকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকিরে ও অধিক পরিমাণ ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, **"হে য়াহুয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর।' এবং আমরা শৈশবেই তাকে দিয়েছিলাম জ্ঞান।"** (১৯:২১)

এখানে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর সাথে কথা বলছেন। আল্লাহর ওয়াদা ও শুভসংবাদ অনুযায়ী দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছে। আল্লাহ তাঁর অসীম করুণাবলে তাঁকে শৈশব থেকেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন মুবারক মুয়াম্মারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ ছেলেরা ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া (আঃ) কে বলতো, এসো আমরা খেলাধুলা করি।" তিনি বলতেন, "আমাদেরকে খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।"

"আমাদের পক্ষ হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা (দিয়েছিলাম)" এর অর্থ এমন হতে পারে যে আল্লাহ স্বীয় দয়া ও রহমতে হযরত যাকারিয়া (আঃ) কে এমন এক সুসন্তান দান করেছিলেন। ইকরিমা বলেন এর অর্থ "আমরা তাকে আমাদের ভালবাসা দান করেছি।" ইয়াহিয়া (আঃ) ছিলেন মানুষের প্রতি খুবই দয়ালু এবং নিজ পিতামাতার প্রতি খুবই অনুগত ও বিনীত।

'পবিত্রতা' বলতে কথা, কাজ, স্বভাব, আচরণ ও হৃদয়ের পবিত্রতা বোঝায়। **"এবং সে ছিল মুত্তাকী, পিতামাতার প্রতি অনুগত ও সে ছিল না উদ্ধত।"** (১৯:১৪)

"তার প্রতি শান্তি ছিল যে দিন সে জন্মলাভ করে ও শান্তি থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" (১৯:১৫) যে তিনটি সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে সে তিনটি মুহূর্ত হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সময়। তিনটি অবস্থাতেই মানুষ এক পৃথিবী হতে অন্য পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় যে পৃথিবী একে অন্যের থেকে ভিন্নতর।

কাতাদাহ হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎকালে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর দরবারে আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন কারণ আপনি আমার চাইতে উত্তম।" হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) বললেন, "বরং আপনি আল্লাহর দরবারে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন কেননা আপনিই আমার চেয়ে উত্তম।"

হযরত ঈসা (আঃ) জবাবে বললেনঃ "আপনি আমার চেয়ে এ কারণে উত্তম যে আমি আল্লাহর কাছে শান্তি প্রার্থনা করেছি কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং আপনার কাছে শান্তি প্রেরণ করেছেন।"

আবদুল্লাহ বিন আবর বলেনঃ হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) আল্লাহর কাছে নিষ্পাপ অবস্থায় উপস্থিত হবেন। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ **"এবং মহান, নিষ্কলুষ ও নবীদের মধ্যে পূণ্যবান।"** (৩:৩৯) অতঃপর তিনি সামান্য মাটি তুলে নিয়ে বললেন তাঁর ত্রুটি মাত্র এতটুকু পরিমাণ কিন্তু স্বীয় কুরবানীর মাধ্যমে তিনি তা আপনোদন করেছেন।

আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হাসান এবং হোসাইন জান্নাতে যুবকদের সর্দার শুধুমাত্র হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়া।"

হযরত যাকারিয়া (আঃ) কি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছিলেন নাকি তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল? এ বিষয়ে দু'টি মত প্রচলিত। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহর বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা হয়ঃ হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর গোত্রীয় লোকজন থেকে পালিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় একটা গাছের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। লোকজন করাত এনে গাছটিকে কাটতে থাকে। যখন করাত তাঁর পাঁজরে পৌঁছল তিনি আর্তনাদ করতে থাকেন। তখন আল্লাহ ওহী প্রেরণ করলেনঃ "তুমি আর্তনাদ না থামালে আমি পৃথিবী উল্টিয়ে দেব।" তিনি এতে আর্তনাদ থামান। ইতোমধ্যে গাছটি করাতে চিরে দু'ভাগ করা হয়। আবার ইদ্রিচ বিন সিনানের বর্ণিত একটি হাদিসের ভিত্তিতে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেনঃ গাছের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণকারী ও করাত দিয়ে বিচ্ছিন্ন নবী হচ্ছেন হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এবং হযরত যাকারিয়া (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। (চলবে)

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট -এর ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুলাই শনিবার নগরীর হামজারবাগস্থ গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরীফ মিলনায়তনে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট -এর ব্যবস্থাপনায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ-এর শাখা কমিটি সমূহের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী, বোয়ালখালী, পটিয়া ও চন্দনাইশ এলাকার মোট ২৫টি কমিটির স্ব-স্ব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (সর্বমোট ৫০ জন) কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালায় পাঠ্যক্রমে 'মাইজভাণ্ডারী দর্শন সম্পর্কে জনমনে প্রচলিত বিভ্রান্তি ও তার নিরসন, নেতৃত্বের যোগ্যতা ও গুণাবলী কুরআনের আলোকে তৌহিদ, রেসালত, বেলায়েত, সূফিবাদ, মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা ও দর্শনের মূল শিক্ষা, ত্বরিকার বুযুর্গদের জীবনাদর্শ' ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্মশালা সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন ট্রাস্টের সচিব এ এন এম এ মোমিন ও আল্লামা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল-আজহারী।

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেজফখানার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলাধীন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফস্থ গাউসিয়া হক মনজিলের আওতাধীন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) প্রতিষ্ঠিত উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার এক সাধারণ সভা গত ১৪ জুলাই শনিবার প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটির আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম হামজারবাগ দায়রা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, আলহাজ্ব কামরুল হাসান চৌধুরী, খোকন, আলহাজ্ব ফরিদ উদ্দিন মাহমুদ, শেখ নুরুল আমিন শাহ (কালু শাহ্), কাজী মোহাম্মদ ইউছুপ, এম মাকসুদুর রহমান হাসনু, এম শওকত হোসাইন, শেখ মুজিবুর রহমান বাবুল, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী নিজামুল ইসলাম, মোঃ আশরাফুজ্জামান আশরাফ, মোঃ নুরুল ইসলাম সওদাগর ও অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষে করণীয়, পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে নিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থাকরণ ও বিতরণ, আগামী বছরের করণীয়, নিবাসীদের একাডেমিক প্রগতি এবং সামগ্রিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২৬ রমজান গাউসিয়া হক মনজিলে ইফতার মাহফিল

আগামী ২৬ রমজান ১৩৩৩ হিজরী, ১৫ আগষ্ট ২০১২ বুধবার পবিত্র শবে কদর মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদ ও উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার ইফতার মাহফিল ও ছাত্রদের ঈদের পোষাক বিতরণ অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলে অনুষ্ঠিত হবে।

মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর ইফতার মাহফিল

গত ৫ রমজান ১৩৩৩ হিজরী, ২৫ জুলাই ২০১২ইং বুধবার হামজারবাগস্থ গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরীফে মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর উদ্যোগে এক রমজান শীর্ষক আলোচনা, মিলাদ ও ইফতার মাহফিল একাডেমীর সভাপতি ড. আবদুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী, মাওলানা শায়েস্তা খান, মাওলানা নিজাম উদ্দীন চিশতী। উপস্থিত ছিলেন গোলাম রসুল, অধ্যাপক সাইফুদ্দীন খালেদ, ড. হেলাল উদ্দীন, আলহাজ্ব শামসুল আনোয়ার, এ. এন. এম. এ মোমিন, অধ্যাপক তরিকুল আলম, প্রফেসর শফিউল পণি, মাওলানা হাবিবুল হোসাইন, এইচ. এম. রাশেদ খান।

হামজারবাগ গাউসিয়া হকভাণ্ডারী খানকাহ শরীফে ইফতার মাহফিল

আগামী ১৯ রমজান ৮ আগষ্ট বুধবার বাদে আছর মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক মকিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহাগর ও হামজারবাগ গাউসিয়া হকভাণ্ডারী খানকাহ শরীফের উদ্যোগে খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুজ্জাহরা ও হযরত শেরে খোদা মুশকিলকোশা মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর বার্ষিক ফাতেহা শরীফ এবং বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর স্বরণে এক আলোচনা, মিলাদ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত থাকবেন

রাহবরে আলম হযরতুলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ.) উক্ত অনুষ্ঠানে সকল আশেকানদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

তাজকিয়ার ইফতার মাহফিল

২৭ জুলাই শুক্রবার হামজারবাগস্থ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফে আত্ম উন্নয়ন মূলক তরুণ সংঘঠন তাজকিয়া কর্তৃক ইফতার মাহফিল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাজকিয়ার সদস্যদের মতামত প্রদান ও আলোচনায় এ সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গুলোর একটি নমুনা তৈরির প্রয়াস নেয়া হয়। সদস্যদের মধ্যে অন্তু, মোজাম্মেল, আরিফ, রিয়াদ, আসিফ, আশিক, বেলাল, রায়হান প্রমুখ নিজেদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। উপদেষ্টা জনাব এ. এন. এম. এ মোমিন, জনাব শায়েস্তা খান এবং জনাব ইফতেখার প্রত্যেকেই তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে তাজকিয়ার অগ্রযাত্রা কামনা করেন।

গাউসিয়া হক কমিটি মাঝিরঘাট শাখার সভা অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, মাঝিরঘাট ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ড শাখার এক সভা জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নাসির উদ্দিন, মোঃ আশরাফুজ্জামান আশরাফ, মিন্টু রহমান, মোঃ আমিনুল ইসলাম সোহেল, মমতাজ আহমদ মামুন, আরিফ, মিজান, এস এম মঞ্জু, মোঃ জসিম, পেয়ারু, সোহাগ প্রমুখ।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি লালদিঘী শাখার আলোচনা সভা

গত ১০ জুলাই মঙ্গলবার মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি লালদিঘী শাখার অস্থায়ী কার্যালয়ে ডাঃ মোঃ লোকমানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদকের বক্তব্যে বলেন আল্লাহ, রাসুল, অলী ও মুর্শিদের প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিনয় অন্তরে ধারণ করে আল্লাহর নিষিদ্ধ সকল কর্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে তাবেদারী, বন্দেগী ও ত্যাগের মাধ্যমে নফ্স আম্মারা ও নফ্স শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মধ্যে হক প্রতিষ্ঠা করে পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ, দেশ দেশান্তরে হক ও শান মান প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ রয়েছে। আল্লাহর পবিত্র হক আদায়ের লক্ষ্যে নিজেকে উপযুক্ত করার জন্য রুহানী মাহফিল, সেমা জিকির প্রয়োজন বিধায় প্রতিমাসে কমিটিতে একবার সম্মিলিত ভাবে একটি দিন ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরও বক্তব্য রাখেন মোঃ একরামুল হক, মোঃ হুমায়ুন কবির, মোঃ কামাল উদ্দীন, মোঃ ইউছুপ প্রমুখ।

গাউসিয়া হক কমিটি বাড়ীঘোনা শাখার উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

গত ২০ জুলাই বাদে জুমা রমজানুল মোবারক উপলক্ষ্যে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, বাড়ীঘোনা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় এলাকায় শতাধিক দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব আবদুল হালিম আল মাসুদ, হাজী ছালেহ আহমদ মেম্বার, মোঃ মফিজুর রহমান মেম্বার, মৌলানা মোঃ উল্লাহ সিদ্দিকী, মৌলানা জাফরুল আলম, হাফেজ কবির, মোঃ আলম, খোরশেদুল আলম, মোঃ এরশাদ, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মোঃ মামুন, মোঃ সেলিম ও কমিটির সদস্যবৃন্দ। এ সময় সংক্ষিপ্ত এক আলোচনায় বক্তাগণ বলেন, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির সকল শাখা সংগঠনের সদস্যগণ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মানব কল্যাণে নিয়োজিত আছেন। মুর্শিদ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আদর্শে উজ্জিবিত হয়ে ইতিমধ্যে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, বাড়ীঘোনা শাখার সদস্যগণ স্থানীয় দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও শিক্ষার্থীদের মাঝে "শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী" জীবনী শরীফ বিতরণ করেন।

চট্টগ্রাম মহানগর মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির মত বিনিময় সভা

গত ২২ জুন মুহাম্মদ ওমর ফারুকের বাসভবনে জনাব মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম মহানগর শাখার এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চট্টগ্রাম মহানগর মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাকসুদুর রহমান হাসনু বলেন মাইজভাণ্ডার শরীফ ও মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশিত মতে চললে দোজাহানে কামিয়াব হতে পারবেন। সংগঠনকে আরো গতিশীল করে মাইজভাণ্ডারী দর্শনকে প্রতি ঘরে ঘরে পৌছাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে ভুলভ্রান্তি পরিহার করে সংগঠনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যাপক অহিদুল হক, হারুন উর রশিদ, মুহাম্মদ ওমর ফারুক, গাজী

এরশাদুল আলম সিকদার, ইকবাল সেলিম, তানভীর মুহাম্মদ রিয়াদ, মুহাম্মদ মিজান, মুহাম্মদ শিহাব, সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ। সভায় মিলাদ ও কেয়াম করেন গাজী এরশাদুল আলম সিকদার, মোনাজাত পরিচালনা করেন, শওকত হোসেন রুবেল।

গাউসিয়া হক কমিটির ঈদে মিলাদুন্নবী

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ বড় ছিলোনিয়া- পাইন্দং শাখার উদ্যোগে গত ১৭/০৭/২০১২ ইংরেজি তারিখে মহান ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ), ফাতেহা ইয়াজ দাহুম, বিশ্বঅলী শাহান শাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর চান্দ্র বার্ষিক ফাতেহা শরীফ ও আসন্ন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে অসহায় গরিব ও দুঃস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি জনাব মো: সায়েম উদ্দিন চৌধুরী (টিপু), সহ–সভাপতি মো:সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো: সেলিম , সাংগঠনিক সম্পাদক মো: সালাউদ্দিন, অর্থ সম্পাদক হুমায়ুন ইমাম চৌধুরী(বিপ্লব) , সহ উক্ত সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আমান উল্লাহ চৌং লিটন, আহাহ্যান উল্লাহ চৌং বিভন, মোঃ জসিম, মোঃ রামেদ, মোঃ সোহেল, বিজয় আচার্য্য, মোঃ রহমত উল্লাহ, মোঃ শাপলা, মোঃ জাবেদ, মোঃ ফোরকান, ইসমাঈল হোসেন (জুন) ও এলাকার আরো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মিলাদ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা বাকের আনছারী। পরে তবরুক বিতরণ করা হয়।

গাউসিয়া হক কমিটি খিতাপচর স্মরণ সভার মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গত ৬ জুলাই ২০১২ শুক্রবার বাদে এশা মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি খিতাপচর স্মরণ সভা শাখা কর্তৃক বেজুরাস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শাখার স্থায়ী সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম (অডিটর)। আলোচনায় অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম। তিনি গত ৯ জুন শনিবার শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট কর্তৃক দিন ব্যাপী কর্মশালায় প্রশিক্ষন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শনের বুযুর্গদের জীবনাদর্শের আলোকে, তৌহিদ, রিসালত, বেলায়ত ও সুফিবাদ সম্পর্কে উপস্থিত সবাইকে জ্ঞাত করান। ট্রাস্ট কর্তৃক যাকাত প্রদানের ও আলোকধারা বিপননের ব্যাপারে নির্ধারিত পত্র পাঠ করে শুনান এবং তা বাস্তবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া হক কমিটি হযরত আমানত শাহ (কঃ) শাখার সভাপতি জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক। উপস্থিত ছিলেন, মোঃ সাইফুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, খোরশেদ, মনছুর, মজিবুর রহমান (মজিব), খোকন, দিদু, বাশি, নুরুল আলম, মিজান চৌধুরী, ইমাম হোসেন, বেলাল, মিজান, মিরাজ, মিঠু, ইকবাল, চন্দনবাবু প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে যাকাত প্রাপ্যতা সম্পর্কে আলোকধারার গ্রাহক বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রচেষ্টার অনুরোধ জানান। তাছাড়া কমিটির দক্ষতা অর্জনের জন্য সেমা, সজিদা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। আগামী রমজান মাসে দুঃস্থ অসহায় গরীবদের ইফতার সামগ্রী বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে মহান মুনিবের দোয়া চেয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমা মাহফিল শেষ করেন এবং মুনাজাত করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল ইসলাম।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির বন্যাদূর্গতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ।

গত ২২ জুলাই রবিবার মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম শাখার উদ্যোগে বন্যাদূর্গতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান সুয়াবিলস্থ ঝন্টু শীলের বাড়িতে জনাব শ্রী অতীন্দ্রলাল শীল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম এর সভাপতি ডাঃ বলাই কুমার আর্চায্য এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তরুন কুমার আচার্য্য (কৃষ্ণ)। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি টিটু চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ধীমান দাশ, সহ সাধারণ সম্পাদক মৃদুল দে, অর্থ সম্পাদক শিপ্রা বসু মল্লিক, সহ অর্থ সম্পাদক ছোটন ধর, সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম তালুকদার, প্রিন্স দাশ, মাইকেল দে, শশী মহাজন, সুমন দাশ, বিষু চৌধুরী, অভি বসু মল্লিক, রুবেল আচার্য্য। উক্ত বন্যাদূর্গত এলাকায় ৫০ পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এদিকে গত ২১ জুলাই শনিবার কমিটির উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক মঞ্জিলের পবিত্র রওজা শরীফের খাদেম জনাব হাফেজ আবুল কালাম, পাইন্দং ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব গৌতমসেবক বড়ুয়া। এতে দুস্থ পরিবারের কয়েকশ পরিবারকে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

গাউসিয়া হক কমিটি ছৈয়দনগর শাখার খাজা গরীবে নেওয়াজের ওরশ শরীফ সম্পন্ন

গত ২০ জুন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ছৈয়দনগর শাখার উদ্যোগে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাঃ)-এর পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ শরীফ, আলোচনা সভা ও তবারুক বিতরণ বোয়ালখালীর ছৈয়দনগর আজিজ ভাণ্ডারীর বাড়ীস্থ দায়রা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র ওয়াজ মাহফিলে প্রধান বক্তা হিসাবে তকরির করেন মাওলানা নূর হোসেন হেলালী। মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন মোহাম্মদ নুরুল হক। নাতে রাসূল পাঠ করেন মোঃ এমরান। ওরশ শরীফ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চরণদ্বীপ ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শোয়াইব রেজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী ইদ্রিছ আলম ও আলহাজ্ব মাওলানা সোলাইমান রেজভী। ছদরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আবদুল আজিজ ভাণ্ডারী, নাছের কোম্পানী ও মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল। মিলাদ মাহফিল ও মুনাজাত শেষে তবারুক বিতরণ করা হয়।

গাউসিয়া হক কমিটি হারুয়ালছড়ি শাখার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

মাইজভাণ্ডারী গাউছিয়া হক কমিটি হারুয়ালছড়ি ২নং শাখার উদ্যোগে ১৮ জুলাই বুধবার পাটিয়ালছড়ি এলাকায় বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গাউছিয়া হক কমিটির কেন্দ্রীয় পর্ষদ সদস্য জনাব শাহেদ আলী চৌধুরী, উক্ত শাখা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব ডাঃ আহামদ ছাফা, বাহরাইন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব নাজমুল হুদা, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী আবদুল মান্নান, কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হারুণ, মোহাম্মদ শাহ আলম, মখলেছুর রহমান, কামরুল হুদা ইপু, আবু সাহাদাত মাসুম, মোহাম্মদ একরাম, মোহাম্মদ আনোয়ার ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত কর্মসূচীতে ০৪ (চার) কেজি করে ৯০ পরিবারকে চাল বিতরণ করা হয়।

আজিমপুর শাখার বিভিন্ন কর্মসূচী

সার্টিফিকেট বিতরণ: সম্প্রতি মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি আজিমপুর শাখার উদ্যোগে পরিচালিত বিনা মূল্যে সেলাই ব্লক ও বাটিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার ১ম ব্যাচ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন অসহায় গরীব মহিলাকে সেলাই ব্লক বাটিক কাজ শিক্ষার মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এতে সার্টিফিকেট প্রদান করেন কমিটির মহিলা উপদেষ্টা জনাবা জান্নাতুল ফেরদৌস এতে আরো উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য মহিলা সদস্যবৃন্দ। এতে উপদেষ্টা মহোদয় বলেন মাইজভাণ্ডারীর শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে এইভাবে হস্ত শিল্প কর্ম শিখে ঘরে বসে মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি পরিবারের দায়বদ্ধতা কাঁদে নিলে সংসার, পরিবার তথা সমাজে বিশৃংখলা থাকবেনা। মহিলাদের সামাজিক মূল্যবোধ বাড়বে। এরপর সেলাই ব্লক বাটিক এর ২য় ব্যাচ আরো ২৫ জন মহিলাকে শিখানোর জন্য উদ্বোধন করা হয়।

বৃক্ষরোপন অভিযান: এদিকে কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পরিচালিত হয়। এতে এক সদস্যের জায়গায় গাউসিয়া হক কমিটির নামে ৭৬টি জাতীয় গাছের চারা লাগানো হয় উক্ত অনুষ্ঠানে কমিটির সকল নেতৃবৃন্দ ও সকল সদস্য উপস্থিত হয়

ইফতার সামগ্রী বিতরণ: পবিত্র রমজান সামনে রেখে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি আজিমপুর শাখার পক্ষ হতে মোট ২৫ জন গরীব সদস্যের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র ২৪তম বার্ষিক ওরশ শরীফের প্রস্তুতি সভা

আগামী ৩০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাদে এশা মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলে আগামী ২৬ আশ্বিন ১১ অক্টোবর ২০১২ইং বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র ২৪তম বার্ষিক ওরশ শরীফের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ.) এতে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ এর সকল কর্মকর্তা ও আশেক ভক্তদের যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ট্রাস্ট সচিব এ এন এম এ মোমিন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ গোলাম রসুল, চ বি অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব ফ্যাকাল্টিজ প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার আরবী প্রভাষক আল্লামা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী।

তাজিকিস্তানে হযরত সৈয়দ আলী হামাদানীর (র) মাজার শরীফ এলাকার একাংশ।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্থাপত্য প্রকল্প :

১. শাপলা নক্শা শোভিত রওজা শরীফ।
২. বাব-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী তোরণ (নাজিরহাট দরবার গেইট)।

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম হেফজখানা ও এতিমখানা।
৩. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি।
৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি।
৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া।
৮. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী এবতেদায়ী কে. জি. মাদ্‌রাসা, পশ্চিম গোমদন্ডী, বোয়ালখালী।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী।
১০. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ (সদর)।
১২. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী স্কুল, শান্তির দ্বীপ গহিরা, রাউজান।
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এবতেদায়ী ও হেফজখানা, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্‌রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহনশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী
১৭. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও এবাদতখানা, চরখিজিরপুর (টেক্সঘর) বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম ২৪৬৮/০২)।
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. যাকাত তহবিল।
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. নাজিরহাট তেমোহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও এবাদতখানা।
২. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৩. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।